সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণু'র স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের কথাসাহিত্য : 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' এবং অন্যান্য রচনা - 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' - স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের প্রক্ষুটরূপ ও 'ময়লা আঁচল' - কালগত দিক থেকে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' যেখানে শেষ হয়েছে 'ময়লা আঁচল' সেখানে শুরু হয়েছে। 'ময়লা আঁচল' কি 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' ?

স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণু'র স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী কথা সাহিত্য

স্বাধীনতা এমন এক কেন্দ্র বিন্দু যাকে ভিত্তি করে স্বাধীনতা-পূর্ব তথা স্বাধীনতার পরবর্তীকালের কথাসাহিত্য আলোচনা করা যেতে পারে। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' এমন দুটি উপন্যাস যেখানে ভারতীয় রাজনীতির তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্বকাল ও পরবর্তীকালের স্বরূপ চিত্রিত। রেণু সতীনাথের বয়কনিষ্ঠ ছিলেন পনের বছরের। কিন্তু অল্প বয়সেই রাজনীতিতে যোগ দেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দুজনে ছিলেন সমসাময়িক। একই রাজনীতি - একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন বার বার। ১৯৪২-১৯৪৪ এ ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে দুজনে ছিলেন। দুজনের সাহিত্যসৃজনে এই বন্দীজীবনের পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলেই সতীনাথ রেণুকে গদ্য সাহিত্য রচনার উপদেশ দেন। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য দুজনে যে রাজনীতিতে এসেছিলেন পরবর্তীকালে উভয়েই তা ত্যাগ করেন। সতীনাথ কংগ্রেসে যোগ দেন ১৯৩১ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর। স্বাধীনতার পর তিনি কংগ্রেস ছাড়লেন (১৯৪৮), যোগ দিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে, কয়েক মাস বাদে তা-ও ছাড়লেন (১৯৪৮) দেশের সঙ্গে যোগ রইল, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে তার যোগ রইল না। পরবর্তী সতের বছর (১৯৪৮-১৯৬৫) তিনি সর্বক্ষণের সাহিত্যকর্মী।

স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতির সঙ্গে সতীনাথ সম্পর্ক রাখেননি। সাহিত্যেও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা বলেননি। 'সংকট' উপন্যাসে বিশ্বাসজীর রাজনৈতিক অতীত অনুচ্চারিতই থেকে যায়। স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতিতে রেণু বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মী হয়েছিলেন তিনি, জয়প্রকাশ নারায়ন ও রামমনোহর লোহিয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন ১৯৩০ সালের আন্দোলনে বাল্যকালে যোগ দিয়েই কয়েকদিনের কারাবাস করেন। ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে বৎসর খানেক জেল। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮এ নেপাল শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেন ও কারাবাস করেন। তারপরে জয়প্রকাশের জন সংঘর্ষ আন্দোলনে যোগদান এবং কারাবাস। আমৃত্যু (১৯৭৭) রাজনীতির সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল।

এই দুই লেখকের ও দুটি উপন্যাসের, লেখক সত্তা ও লেখাকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না যদি আমরা দেশকালের পরিচয় না জানি। ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রেণু ও সতীনাথকে আকর্ষন করেছিল তার ভূমিকা রচিত হয়েছিল অনেক আগেই (সতীনাথের ১৯৩১ রেণুর ১৯৩০ কে যদি রাজনীতিতে প্রবেশ করবার বছর হিসেবে ধরে নেই)। ১৯২০-তে গান্ধীজী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর নাগপুরে কংগ্রেসের সাধারন অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ১৯২২ খ্রীঃ তে গান্ধীজীর নেতৃত্বে করদান বন্ধ করা এবং প্রত্যক্ষ আইন অমান্য করার আয়োজন হয়। ঐ বছরেরই ৫ই ফেব্রুয়ারী ক্রুদ্ধ জনতা চৌরিচৌরা থানা আক্রমন করে ও পুড়িয়ে দেয়। তাতে ব্যথিত হয়ে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ১০ মার্চ গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন। কিন্তু আন্দোলন থামে না। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অন্ততঃ তিরিশ হাজার মানুষ সারা ভারতে কারাবরন করেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতে খাদি-গ্রামোদ্যোগের ব্যাপক চেষ্টা চলে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ বিখ্যাত ডান্ডি অভিযানের সূত্রপাত করেন গান্ধীজী। ৬ই এপ্রিল তিনি ডান্ডি যাত্রা করেন। লবন আইন ভঙ্গ করেন ১৩ই এপ্রিল। লবন আইন ভঙ্গের অপরাধে ৫ই মে ১৯৩০-এ গান্ধীজী আবার বন্দী হন।

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন থেকে ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন - এক দশক গান্ধী নেতৃত্বে চালিত, মথিত, প্লাবিত, উদ্বেলিত হয় ভারবর্ষ। এই দশকটা ছিল সতীনাথের ছাত্রজীবন। তখন তিনি কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হননি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সতীনাথ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। (১৯৩২-১৯৩৯) গান্ধীজীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফা আইন-অমান্য আন্দোলনে যখন পশ্চিম ভারতে উথাল-পাথাল, তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে। তারপরেই ঢাকায় বেধে যায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। পশ্চিম ভারতে সোলাপুরে শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি দেখা দিল। তিনজন বিশিষ্ট বংশের যুবককে এই অশান্তির প্ররোচক ঠাউরে সামরিক আদালতে সরাসরি বিচারে তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হল।

পশ্চিম ভারত ও পূর্বভারতের এই সব আন্দোলন ও পীড়ন, অভ্যুত্থান ও নিষ্ঠুর দমনের (১৯৩০) সংবাদ পূর্ণিয়ায় এসে পৌঁছেছিল। তখনো সতীনাথ সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেননি।

কংগ্রেসের দাবি ছিল পূর্ণ স্বরাজের। ১৯২১-৩০ দ্বৈরাজ্য শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে বৃটিশ সরকার অনেক কমিটি ও কমিশন বসায়। তার ফল ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা চলছে, সকলের আশা নূতন কিছু হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে বা অন্তর্বর্তীকালে ইংরেজ শাসকেরা তাঁদের শাসন যুষ্টি শিথিল করে ভারতীয়দের হাতে শাসনভার তুলে দেবেন - একথা অনেকেই ভাবছিলেন। সেই ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হল আশংকা : ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্বটা হবে কঠিন সংকটের, ভীষণ পরীক্ষার কারণ হল বর্ধমান হিন্দু-মুসলমান দ্বৈনক্য। ১৯৪৬-এ এই দ্বৈনক্য তীব্র হয়ে উঠল। কলকাতা নোয়াখালি, বিহারে জ্বলে উঠল দাঙ্গার আগুন। শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান দুপক্ষই বলে উঠল, আমাদের চাই আলাদা রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ হল বিভক্ত, আমরা পেলাম রক্তাক্ত স্বাধীনতা (১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭)।

কিন্তু এই স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষকে পেরোতে হয় দ্বৈনক্যের চোরাবালি আর সংগ্রামের পথ। ১৯৩৭-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়টা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ছিল সংকটের কাল। আটটা প্রদেশের মন্ত্রিসভায় ও ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দল সংখ্যাধিক্যের

জোরে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসে গোল বাধল নিজেদের মধ্যে। ১৯৩৮-এ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রপতি) হন সুভাষচন্দ্র বসু। নতুন বৎসরে (১৯৩৯) সুভাষচন্দ্র বসু পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হন। গান্ধীজী - প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অধিকাংশ কংগ্রেসী নেতা সহযোগিতা না করায় তিনি পদত্যাগ করেন, তখন গান্ধী - মনোনীত ব্যক্তি কংগ্রেস সভাপতি হন। স্মর্তব্য এই বছরেই সতীনাথ কংগ্রেসে যোগ দেন (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)।

গান্ধীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয় - ভারতের রাজনীতিতে ও কংগ্রেসের ইতিহাসে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সতীনাথ ভাদুড়ী এসবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, একথা স্বীকার্য। 'জাগরী'তে এসবের ছাপ রয়েছে, এই উপন্যাসে তৎকালীন ভারতবর্ষের জটিল রাজনীতির পরস্পর বিরোধী স্রোতের স্পষ্ট ইশারা পাওয়া যায়। ফণীশ্বর নাথ রেণু ১৯৩০ এর আগেই রাজনীতিতে যোগ দেন। গান্ধীবাদী কর্মী হিসেবে তিনিও অসহযোগ আন্দোলনে জেলে যান। রেণুর পঞ্চম উপন্যাসে 'কিতনে চৌরাহে'তে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, তৎকালীন যুবসমাজ, গান্ধীবাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ছবি আছে। 'জাগরী'র সাথে এই উপন্যাসটির তুলনা চলে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সমসাময়িক ঘটনার ছবি প্রসঙ্গে এই উপন্যাস প্রসঙ্গে অন্যটির কথা মনে আসে মাত্র। 'ময়লা আঁচলে'র প্রথমাংশেও পরাধীন ভারতবর্ষের চিত্র বিধৃত আছে। উপকরণ, ঘটনাস্থল, মানুষজন অনেক সময় এক হলেও দুই লেখকের শৈল্পিক গ্রহনে বা বর্জনে তা আলাদা হয়েছে।

ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি ও সমাজের বিবর্তন কে কেন্দ্রভাগে রেখে স্বাধীনতার পূর্বেকার ও পরবর্তীকালের প্রেক্ষাপটকে সতীনাথ ও রেণু নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন তাঁদের রচনায়। স্বাধীনতা লাভের পর সৎ ও সচেতন সতীনাথ বুঝাতে পেরেছিলেন এই স্বাধীনতা খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য নয়। বাবু সাহেব বচ্চন সিং ও লাডলী বাবুদের জন্য (ঢোঁড়াই চরিত মানস) এই স্বাধীনতা ভুস্বামীদের ভিতর থেকে কী ভাবে স্বাধীন ভারতে শাসকশ্রেণী অংকুরিত

হয়েছে তারই ইতিহাস ইঙ্গিতে রেখে যান। লাডলী বাবুর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। লাডলীবাবু চেয়ারম্যান হবার পরেই ডিস্ট্রীকবোর্ডের ওভারসিয়ার এসে পাকুড় থেকে বাবুসাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা বানিয়ে দেয়। গাঁয়ের লোক বলাবলি করে 'সাহেবী টুপী' না থাকলে কি হবে লাডলীবাবু ও হাকিম। নতুন হাওয়া গাড়ী কিনেছে সে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের এই নতুন ছবি আরো স্পষ্ট হয়েছে ফণীশ্বর নাথ রেণুর রচনায়। স্বাধীনতালাভের কয়েকদিন পরেই সৎ নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমী গান্ধীবাদী কর্মী বায়নদাস চোরাকারবারীদের হাতে খুন হয়। সাগরমল, দুলাল চন্দ্র কাপড়াদের মত অসৎ ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীরা তাদের নিজের এলাকায় কংগ্রেসী নেতা হয়ে যায়। বিশ্বনাথ প্রসাদের মত সাধারণ শ্রেণীরা কংগ্রেস দলের পদ পেয়ে যায় প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যর জোরে (ময়লা আঁচল)। স্বাধীনতা পরবর্তী নয়া পরিস্থিতিতে সাধারণবর্গরা রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। 'পরতিপরিকথা'তে দেখি শ্যামগড়ের রাজা কামরূপ নারায়ন চৌধুরী, জমিদারী প্রথা বিলোপ হবার সাথে সাথে নিজেদের অস্তিত্ব-প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার স্বার্থে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য 'প্রজাপার্টি' গঠন করেন। এই সব ভ্রষ্টাচারে আমলা, দেশনেতা, পার্টিকর্মী সবাই তাতে অংশ নেয়। ফণীশ্বর নাথ রেণুর প্রতিটি উপন্যাসেই স্বাধীনোত্তর এই ভ্রষ্টাচারের চিত্র পাওয়া যায়। 'ময়লা আঁচলে' যা শুরু তা সতুর দফকে এসে 'রেণুর 'পল্টবাবুরোড' উপন্যাসে যেন আরো বিস্তৃত হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, কেবল অর্থনীতি ক্ষেত্রে নয়, শুধু রাজনীতি, বাস্তুসংস্থান, মানবিক ভূগোল, জনবিন্যাস, জনসমাহার বৈষম্য, নগর-পরিকল্পনা, নব নব শিল্পনগরীর উদ্ভব ও মহানগরীর অভ্যুদয়ের ফলে নিত্য নব সমস্যা দেখা দিল। শহরবাসী বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, সংকীর্ণতা ও বাস্তববিমুখ আত্মরতির শিকার হচ্ছে। সনাতন মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, সমাজজীবনে অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, অহিংস জনবিক্ষোভ, নাগরিক জীবনের পদে পদে সমস্যা, জীবন ধারনের কষ্টকরতা, নৈতিক মূল্যাদর্শের অবসান, অসতের জয়, মঙ্গলের পরাজয়, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে নিরাপত্তা-বোধের অভাব, - সবটা মিলিয়ে এক অগ্নিগর্ভ মুহূর্ত।

সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণুর গল্প-উপন্যাসে এই অশান্ত নগরাশ্রয়ী ব্যক্তির অসহায়তা ও বিপন্নতার ছবি পাই। সেই সঙ্গে পাই গ্রামীন ভারতবর্ষের সহস্র বিশ্বাস ও সংস্কারে আবদ্ধ মানুষের বিভ্রান্তি ও অসহায়তার ছবি। সময়ের গতি দ্রুত, পরিবর্তনের গতি দ্রুততর, গঠনের গতি দ্রুততর। এই দ্রুতগতি পরিবর্তমান ভারতের ছবি দেখি সতীনাথ ও রেণুর গল্প উপন্যাসে। বিশেষ করে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসে দুটিতে স্বাধীনতা এমন এক কেন্দ্রবিন্দু যা ভিত্তি করে স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী মানুষ বদলেছে। এই প্রবহমান পরিবর্তনের স্বরূপকেই দুই লেখক ধরতে চেয়েছেন তাঁদের উপন্যাসে। দেশ-কালের নিরিখে ক্রমাগত বদলে যাওয়া মানুষের ছবিই যেন এই দুই মহৎ ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট ছিল। উপন্যাসের গতিশীলতা সম্পর্কে Christopher Caudwell - তাঁর 'Illusion and Reality' গ্রন্থে বলেছিলেন - "In the Novel and the world of harmony a man contemplates the rich and complex movement ([illegible]) of the passions of man in a changing and developing world."[৬] গতিশীলতা - পরিবর্তমান সমাজ মানুষের ছবিই এই দুই উপন্যাসের সমধর্মিতার প্রধাণ সূত্র, যা কডওয়েলের উক্তিতে মনে পড়ে।

সতীনাথ 'জাগরী'র মধ্যবিত্ত জীবন সংকট থেকে ক্রমেই দেশের সাধারন মানুষের স্বার্থসংকট সমস্যা, রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগ স্থাপন করতে আগ্রহী হয়েছেন। 'জাগরী'-তে মধ্যবিত্ত সচেতনতা ও সমাজের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ছবি আছে। আর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ আছে 'মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর' জনজীবনের পরিবর্তনের রূপরেখা। ঢোঁড়াইরা সমাজকে বদলে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও বদলে যাচ্ছে। এখানে মধ্যবিত্ত সচেতনতা ছেড়ে সতীনাথ ঢোঁড়াই-এর চোখ দিয়ে পরিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু কাজে লাগান, যাতে তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই হয়ে যায় সারা দেশের

খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি। স্বাধীন ভারতেই সমাজ বদলানোর বিস্ফোরক অবস্থা আছে। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' -এ অভিমন্যু শেষ অবধি স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে আধিয়ারদের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজ শাসকদের শাসন ভেঙে ফেলার সঙ্গেই সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামও দানা বাঁধছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যেই ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা লাডলীবাবু ও বলীরামপুরের জুট মিলের মালিকদের হাতে এসে গেল। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'-এ সতীনাথের রাজনীতি সচেতন মন বুঝেছিল শ্রমিকের সঙ্গে কৃষকের ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। কৃষক-শ্রমিক ঐক্যশক্তির কল্পনা জনযুদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যসূচক ঘটনা এবং সে বিষয়ে সতীনাথের চিন্তা অত্যন্ত আধুনিক ভাবনার প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। শ্রমিক নেতা অভিমন্যু বলীরামপুরের জুটমিলের অসৎ সহকারী ম্যানেজারের মিথ্যা চক্রান্তে অপমানিত হয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে শাস্তি পেয়ে গ্রামে চলে আসে। অভিমন্যু পারত অপমানের উত্তর দিতে কারন তার সঙ্গে ছিল মীনাকুমারীর চিঠি, কিন্তু তা না করে সে চলে এলো ভিন্ন জীবনে - কৃষিজীবনের সংস্পর্শে, এখানে নিজেকে অন্যভাবে গড়ে তুলল। কিন্তু অভিমন্যুর জীবন ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরা। বলীরামপুর থেকে ঘন্টেশ্বরী থানার শিরানিয়া গ্রামে এসে অত্যাচারী জমিদার অযোধ্যা চৌধুরীর শোষনের বিরুদ্ধে অভিমন্যু গরীব বঞ্চিত চাষীদের সংঘবদ্ধ করে দাবী তোলে - ফসলের ভাগ দিতে হবে, শুরু করে দেয় শিরানিয়ার 'বকাশৎ আন্দোলন'। তারই জন্য জমিদারের লেঠেলরা আর ঘন্টেশ্বরী থানার পুলিশরা অভিমন্যুকে লাঠির পর লাঠি মেরে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে যায় এবং জমিদার-পুলিশের যোগসাজসে অভিমন্যুর বিরুদ্ধে লুঠতরাজ-ডাকাতি-অবৈধ জনতার নেতৃত্ব করার অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেফতারী পরওয়ানা হাসিল করে। অর্ধমৃত অচৈতন্য রক্তাক্ত দেহ অভিমন্যুকে গোপনে নিয়ে আসা হয় বলীরামপুর জুটমিলে ইউনিয়ন অফিসে। সেইখানে মৃত্যু হয় অভিমন্যুর। তার চিতার আগুনে শিউচন্দ্রিকা পাঠ করল সেই গোপন চিঠি, নিরপরাধ অভিমন্যুর কথা জানল সকলে।

বকাশৎ আন্দোলনে অভিমন্যুর যোগদানপর্ব সতীনাথের একটি নির্ভুল রাজনৈতিক পর্যবেক্ষন। এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরে সতীনাথের রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণের দৃষ্টান্ত তাঁর সততার এবং প্রতিবাদীতার একটি সর্বজনবিদিত প্রমাণ। তাঁর অনেক লেখাতেই তখন স্বাধীনতা সম্পর্কে বহু বক্র মন্তব্য দেখা যায়। 'চিত্রগুপ্তের ফাইলে' ও এরকম একটি মন্তব্য - " শিরনিয়া গ্রামে আজাদী পেয়েছে কেবল অযোধিয়া চৌধুরী। সরকারের মাথায় এখন রাজ্যের ঝঞ্ঝাটের বোঝা। পড়ে-পাওয়া আজাদীর নানারকম ফ্যাকড়া।"[২] এ জাতীয় আরো দু-একটি পংক্তি সতীনাথের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরে আমাদের কাছে। - 'অযোধিয়া চৌধুরী জানে যে তার এই পাঁচ মাসের আজাদী ফাঁসির আগে মিষ্টি খেতে পাওয়ার আজাদী, জমিদারী প্রথা লোপের আগে তাই এই মরণ-কামড়।'[৩] জমিদারী প্রথা লোপ হয়েছিল ঠিকই স্বাধীন ভারতে, কিন্তু অযোধিয়া চৌধুরীরা বস্তুত মরেনি আজও। শুধু জমিদার শব্দটাই তারা নামের অলংকার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেনা। তাই 'মিথ্যা আশা'র কথা বলা। সতীনাথ তাঁর সততা আর সমৃদয়তার মাপকাঠি দিয়ে তৎকালীন নেতাদের বিচার করেছিলেন মনে হয়। সে জন্যেই অযোধিয়া চৌধুরীর আজাদীকে তিনি ফাঁসির আগের মিষ্টি খেতে পাওয়ার আজাদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু ফাঁসি তো অযোধিয়া চৌধুরীদের হলো না, যা চেয়েছিলেন মানবপ্রেমিক সতীনাথ।

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি সতীনাথ 'চোঁড়াই চরিত মানস'র পরে লিখতে শুরু করেন আগে শেষ করেন। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে রাজনীতি ঘটনা হিসেবে স্থান পেলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মনের অন্তর্মুখী অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষনের ওপরই লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন। সে তুলনায় পরবর্তী উপন্যাস 'চোঁড়াইচরিত মানস'এর প্রথম ও দ্বিতীয় চরনে রাজনীতি অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই উপন্যাসে রাজনীতি মানুষকেও তার চির পরিচিত সমাজকে বদলেছে।

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিনিধি 'জাগরী'র পরিবারটি রাষ্ট্র সচেতন হয়ে উঠতে দেখা যায়। দ্বিতীয় দফায় ১৯৩০-এর অসহযোগের ডাক, সত্যাগ্রহ,

আইন অমান্য সাধারণ মানুষের সীমানার প্রান্তে যে ঢেউ তুলেছিল তারই বাস্তব আলেখ্য তৈরী হয়েছে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'এর প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে। সাধারণ মানুষ এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। কিন্তু তাদের অভ্যস্ত সংস্কারবদ্ধ জীবনে একটা ঝড়ের হাওয়ার সংকেত শুনেছিল, তাকে তারা নিজেদের সুবিধা মতো ব্যাখ্যা করে নিয়েছিল ও আন্দোলনের কর্মপদ্ধতিকে নিজেদের মতো করে তৈরী করবার চেষ্টা করেছিল। কারন তাদের কাছে ইংরেজ রাজা-বাহাদুরের অস্তিত্বের চেয়েও তাদের শোষকদের চেহারাটা এত প্রকট ছিল যে সেটাকে সামলাতেই তারা বেশি ব্যস্ত হয়েছিল। হাকিম দারোগা, কলেক্টর, চ্যারম্যান, উকিলবাবু বা বচ্চনসিং, রাজা সাহেব, আনোখিবাবু এমনকি বাবুলাল চাপরাসি, ছড়িদার তাদের কাছে 'হাওয়াগাড়ী চালানো সাহেবদের চেয়ে বেশী ভয়ংকর ছিল'। 'বাদশাহী বদল' 'সার্বিকমুক্তি' এসব কথা তারা বোঝেনা। এরা বুঝেছিল দিন বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে। সতীনাথ কংগ্রেস, গান্ধীবাদী বা সোস্যালিস্টদের রাজনৈতিক ইতিহাসকে উপন্যাসে রূপায়িত করতে চাননি। তিনি মানুষের চেতনার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই রাজনৈতিক সত্য ঘটনা বিয়াল্লিসের আন্দোলন কে উপস্থাপিত করেছেন। 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধীজীর ও তাঁর দলের ভূমিকা, আজাদদস্তার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার স্বরূপ ও পরে নিজেদের কাছেও সাধারন মানুষের কাছে কি রকম সমাদৃত হয়েছিল তার ঐতিহাসিক চিত্র এ উপন্যাসের অতিরিক্ত সম্পদ।

উপন্যাস ছাড়া ছোটগল্পেও সতীনাথ ৪০-এর দশকের ভারতবর্ষের প্রকৃত রাজনৈতিক চেহারা - তার ত্রুটি বিচ্যুতি, আদর্শবাদ ও দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উপদলগুলির কার্যকলাপ, মতামত অসঙ্গতিকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সামাজিক জীবনে ও ব্যক্তি-মানসে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটিকে উদ্ঘাটন করেছেন শিল্পী সতীনাথ।

সতীনাথের ছোটগল্পের সামগ্রিক আলোচনা এখানে করছি না। যে পরিবর্তনের ছবি উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করেছি তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ছোট গল্পে কিভাবে

আশ্রয় পেয়েছে, তাই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। স্বাধীনতা ও সমকালীন বাস্তবতা এই ধারার গল্পের আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট গল্পের সাহায্য আমরা নেব। ১৯৪৮ এ প্রকাশিত 'গণনায়ক' গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি সমকাল পরিবেশকে ছুঁয়েছে।

'গণনায়ক' সতীনাথের একটি বিশিষ্ট গল্প। ১৯৪৭-এর আগষ্টমাসে দেশ-বিভাগের সময়ে লেখা এই গল্পটি নবলব্ধ স্বাধীনতা সম্পর্কে সতীনাথের দৃষ্টিভঙ্গীকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের গণনায়কদের এক নিখুঁত ছবি এই গল্পটি। গণনায়কে কোনো প্রথাসিদ্ধ কাহিনী নেই। সতীনাথ তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'তে প্রাক্-স্বাধীনতা সময়ের ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তি-গত জীবনে কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার জন্য গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভাবনাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'গণনায়ক' গল্পটি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক ভাবনার ফল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল্য হিসাবে দেশ বিভাগকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। - "স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে দেশ বিভাগের ব্যবস্থাকে একটি অনিবার্য দুর্ঘটনা বলিয়া তিনি মানিয়া লইতে পারেন নাই বিমূঢ় কংগ্রেস ভক্তের মতো। ইহার পিছনে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন - ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূট ভেদনীতি, কংগ্রেসলীগ নেতাদের অসহায় আত্মসমর্পণ, জমিদার ও ব্যবসাদারদের হঠাৎ 'গণনায়ক' সাজিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর সযত্নে আতংক ও বিদ্বেষ পরিবেশন ও তাহার সুযোগ লইয়া হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের নিরপরাধ গৃহস্থগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন ও উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের চরম দুর্দশা। 'হেঁজি পেঁজি নাট নয়, খানদানী, রাজার বাড়ীর ছেলে' লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও লীগ নেতারা যখন দেশবিভাগের নীতি মানিয়া লইয়া কমিশনের রোয়েদাদের প্রতীক্ষায় দেশবাসীগণকে উৎকট উৎকণ্ঠার পাকে সিদ্ধ করিতেছিলেন, তাহারই এক অনবদ্য চিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহার 'গণনায়ক' নামক গল্পে।" [৪]

নাগরনদীর পুলের এপারে ওপারে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান - কোন্ ভাগে কোন অঞ্চলটা পড়বে তা নিয়ে হিন্দু মুসলমান গরীব সাধারণের ভয়ভীতিকে বাড়িয়ে দিয়ে মুনাফা লোটেন মুনীমজী।

"মুনীম সাহেব কী জয়, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়।" -জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে।

মুনীমজী ওপারে সকল লোককে বলেন যে, 'সকালে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ আর রেখোনা। আমার কাছে দিয়ে দিও। আমি গভর্নমেন্টের কাছে জমা করে দেব। হিন্দুস্থানে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ রাখা বারণ।"

তারই দেওয়া পাকিস্তান - নিশানগুলি আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে। তিনি মনে মনে ভাবেন - এগুলি নিয়ে কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। গোড়া গোঁসাইয়ের খালি বাড়িতে উঠবেন, তার জমিটমি গুলো একবার দেখেও আসবেন, সেখানে বেচতে হবে এই পাকিস্তান ঝাণ্ডাগুলো। আর সেখানে যোগাড় করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থান পতাকাগুলি। একই জিনিস দুবার করে বেচবেন। তিনি হিসেব করেন সব মিলিয়ে তার কত হল।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'আন্টা-বাংলা' অসাধারণ গল্প। এই গল্পটি প্রথম ১৩৫৪ সালে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। গল্পটির সূচনা বিহারের নীলকর সাহেবদের স্বর্ণযুগে। 'আন্টা বাংলা'- তরাই অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ইউরোপীয়ান ক্লাবের ইতিহাস। ইতিহাস সেই সব ওঁরাও আধিয়াদারদের যারা পুরুষানুক্রমে এই নীলকর সাহেবদের সেবা করে অহেতুক অত্যাচার সহ্য করেছে। তরাই-এর ভিজে মাটির কালো মানুষদের অপরিসীম সহ্যশক্তি। নকল নীলের উদ্ভাবন নীলকর রাজত্বের ইতি টানলেও আন্টা বাংলার দীপ্তি অম্লান রইল। নীলকর সাহেবরা পরিবর্তিত হল জমিদার শ্রেণীতে। পাদ্রী সাহেব ফাদার টুডুর কাছে 'রবিবারে কাজ করতে নেই' শিখে কাজে গর-হাজির থাকায় বিরসা ওঁরাও প্রাণ দিয়েছিল এই আন্টাবাংলার নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে। তার নাতি বোটরা ঠাকুর্দার মৃত্যুর দিনে কবরের উপর ফুল রাখে - আন্টা বাংলার ফুর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। আন্টাবাংলার এক সময়ে দুঃসময় আসে। ক্রমে আন্টাবাংলা জনশূন্য হয়, বাঙালী বাবুদের কসমো পলিটন ক্লাবের লোভনীয় প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে

বোটরা আন্টাবাংলাকেই আঁকড়ে থাকে, এবং শেষে একদিন আন্টাবাংলাতেই বোটরা মারা যায় আট-টনি মোটর রোলার চালাতে চালাতে ঠাকুর্দা বিরসা ওঁরাও-এর মৃত্যুদিনে।

এই গল্পটিকে কেউ সমাজসমস্যামূলক বা মনস্তত্ত্বমূলক বলেন। গোপাল হালদার এই গল্পটি সম্পর্কে লিখেছিলেন - "একটু রোমান্টিক, কিন্তু ইঙ্গিতময় পরিণতি। একটি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে দেখলে- পড়ন্ত জমিদারদের পতনের মধ্যে যেমন তারাশংকর দেখতে পান একটা বিষন্ন মহিমা, এই শোষিত দলিত মানুষদের মনে যেন তেমনি এই মোহ - দাসপ্রথার অবসানে দাসেদেরও যেমন অনেকে চেয়েছিল তাদের দাসজীবন অক্ষুন্ন থাক।"[৫] গোপাল হালদারের এই মতকে সমর্থন করা যায় না কারণ গল্পটির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিবাদ। যে প্রতিবাদ বিরসা বোটরার মৃত্যুতে শেষ হয় না। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ও সচেতন শিল্পী কেবলমাত্র নৈসর্গিক ও সাময়িক কারণে আন্টাবাংলার অবসান সূচিত করবেন - এই ধরনের অনুমান কষ্টকল্পিত। 'আন্টা বাংলা' গল্পটি পড়ে হিন্দ কিষাণ পঞ্চায়েৎ-এর জনৈক সমাজকর্মী সতীনাথকে জানান - 'I have just finished your book 'Gana Nayak' may be due to my present preoccupation with the problems of Champaran or may be due to its intrinsic merit; I have been highly impressed by ANTA-BANGALA. I wish you could write the second chapter of this story depicting the rise of Mill Farms and Congress leader's land-grabbing'.[৬]

সতীনাথ বাস্তব সমস্যা ও সমসাময়িক সামাজিক সংকটের ওপর বস্তুনিরপেক্ষ স্বাধীন চিন্তার আলোকপাত করেছেন। আন্টা বাংলা এক সময় ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প আন্টা বাংলার ভিত নড়িয়ে দেয়। বোটরার আট-টনি রোলারের আঘাত আন্টা বাংলার 'শেষ চিহ্নটুকু মুছে দেয়। 'পশ্চিমা হাওয়ায় আন্টাবাংলার ইঁটের গুঁড়া উড়িয়া দিগন্তে মিলিয়া যায়।' কিন্তু যে ট্রাডিশনের সূচনা আন্টাবাংলা করে সেই

ট্রাডিশন ধ্বংস হবার নয়। নীলকর সাহেবরা জমিদার শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। সতীনাথ লেখেন : নীলের চাষ গিয়াছে, কিন্তু জমিতো যায় নাই। রাতারাতি তাহারা পাইতে চায় বনেদী জমিদারের আভিজাত্য। আণ্টাবাংলার বিলুপ্তি শোষনের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় না। পাশেই আর একটা আণ্টাবাংলা 'কসমোপলিটান ক্লাব' গড়ে উঠে। শোষকের চরিত্র পাল্টায় না। তারা নীলকর থেকে জমিদার, আবার জমিদার থেকে আমলা শ্রেণীতে উন্নীত হয়। এভাবেই চম্পারণের কৃষক বিদ্রোহে, কংগ্রেসী নেতাদের জমি দখলে আণ্টা-বাংলার ঐতিহ্যই ফিরে ফিরে আসে - 'মহাশ্বেতার বীরসা মুণ্ডার মত উলগুলনের ডাক হয়ত সতীনাথের বিরসা, বোটরারা দেয় না- তবু এই ধোঁয়া, আগ্নেয়গিরি, আগুন, বাবুদের অনুষঙ্গ এক নিকট সংঘর্ষের পূর্বাভাস ছাড়া অন্য কিছু নয়।"[৭] নীলকরদের সাহেবদের জমিদার শ্রেণীতে রূপান্তর। দেশীয় জমিদারদের সাথে তাদের প্রতিযোগিতা সংঘর্ষের ঐ চিত্র রেণুর 'পড়তি পরিকথা'তে বিস্তৃত ভাবে আছে।

সতীনাথ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজের ত্রুটি, নীচতা, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা, দেশশাসনে বিশৃংখলা আমলাতন্ত্রের কর্মশৈথিল্য, দায়িত্বহীনতা ও অর্থলোলুপতা, সরকারী অব্যবস্থা, রাজনীতিকদের নীতিহীনতা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহলাভের প্রয়াস, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থ-হরিজন সমস্যা ইত্যাদি বিষয় কিছু গল্পের বিষয়বস্তু করেছেন, যেমন - 'চরণদাস, এম-এল-এ, 'পরকীয়-সন-ইন-ল', তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ', 'জোড়-কলম', 'শেষ সংখ্যান', 'সরমা', 'মা আমুফলেষু', এক ঘণ্টার রাজা, 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ', 'একচক্ষু'।

চরণদাস এম-এল-এ' আর 'পরকীয় সন-ইন-ল' অন্তঃসারশূন্য নীতিভ্রষ্ট রাজনীতিকদের নিয়ে লেখা এ দুটি গল্পের চরিত্র স্বাধীনতা-উত্তর-ভারতের 'প্রোডাক্ট'।

'পরকীয়া সন-ইন-ল' গল্পের আরম্ভ অত্যন্ত সাবলীল ও সহজভাষায় - "ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া ছিল, পবন অনুকূল ছিল, কাজেই শ্রী সাহেবরাম, এম-এল-এ কে Co-ordination বিভাগের উপমন্ত্রী হবার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হল না।" দলের

তত্ত্ববিৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে দুটি বাধা সম্মুখে শ্রী সাহেব রামজীকে সচেতন করে দিলেন। একটি Parkinson's law, অপরটি Bottleneck. প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন উপমন্ত্রী মহোদয় অতি সহজেই PParkinson's Law -র গূঢ় তত্ত্ব বুঝে ফেলে বললেন "ওটুকু বোঝবার মত ইংরাজীর জ্ঞান আমার আছে। পরের(পরকী) সন-ইন-ল কেন, নিজের জামাইকেও আমি চাকরী দেবনা।" পাট ধোঁয়ার জন্য জলে নামলে জোঁকের অত্যাচারের থেকে রেহাই পাবার জন্য 'মুবিল' নামে আশ্চর্য ঔষুধ বাঙলি উদ্বাস্তুরা ব্যবহার করে। জিরানিয়া গ্রামে 'মুবিলে'র খুব চাহিদা তাই কালোবাজারীদের সঙ্গে বড় অফিসারদের যোগসাজশ থাকায় সব 'মুবিল' উধাও হয়েছে। উপমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে গেলে তিনি সংবাদপত্রে তাঁর বিবৃতি দেখতে বলেন। অতি অল্পদিনেই সাহেবরামজী মন্ত্রীর প্রধাণ কাজগুলি আয়ত্ত করে ফেললেন - প্রায়ই সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন, ট্যুর করেন ও সভায় ভাষণ দেন। তিনি প্লেনে জিরানিয়ায় 'মুবিল' পাঠানোর সহজ পন্থা অবলম্বন করলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন যারা 'মুবিল' উধাও করেছে তাদের তিনি 'বম্ব' দিবেন। তিনি এই কঠিন 'Bottleneck' ভাঙবেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ীরা উপমন্ত্রীর অশালীন ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। প্রধানমন্ত্রীর কাছেও গৃহীত প্রস্তাবের কপি গেল। সাহেবরামজী এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন এই প্রথম হচ্ছেন। পরামর্শ চাইলেন তাঁর সহকর্মী এক বিচক্ষণ অভিজ্ঞ মন্ত্রীর। গোপন পরামর্শের শেষে সংবাদ - পত্রে সাহেবরামজীর বিবৃতি প্রকাশিত হল - 'বম্ব' দেবেন এমন কথা তিনি বলেননি, সাংবাদিকরা ভুলশুনে থাকবেন। তিনি আসলে বলেছিলেন 'বমবা'(জলের কল) দেবেন।

নবীন গণনায়কদের প্রতি সতীনাথের চাপা বিদ্রূপ 'চরণদাস এম-এল-এ' গল্পটিতেও আছে। 'চরণদাস'কে স্থানীয় লোকেরা বলে ইয়েমিয়ে নিয়ে সাহেব বা মায়েলজী। হাই কমান্ডের আদেশে মায়েলজী এসেছেন তার নির্বাচন ক্ষেত্রর পুরনো পার্টি অফিসে। ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার অভিযোগে তাঁকে আগামী বছর নমিনেশন

না দেওয়া হতে পারে এমন কথা শুনে তিনি দৌড়ে এসেছেন ভোটারদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে। 'জনসম্পর্ক' বাড়াবার শ্লোগানে এসেছেন মায়লেজী, তাই এখন চরণদাসজী হয়েছেন 'ভোটার-চরণদাসজী'। চরণদাসজী এই ব্যঙ্গের খোঁচা হাসিমুখে সহ্য করেন। লখনলাল, বচকন মাহাতো প্রমুখ পুরনো কর্মীদের বিদ্রূপের উত্তরে তিনি একটি কথাও বলেন না। গ্রামের পথে মুনরা, বিরসা, তিরখারথা, চথুরি - যার সঙ্গেই দেখা হয়, চরণদাসজী তাকেই কুশল সম্ভাষণ করেন, কিন্তু সবাই তাকে এড়িয়ে যায়। ব্যাপারটা কী ? শেষে বুঝলেন, গত তিন বছর এক গুরু মহারাজ বেশ জমিয়ে বসেছেন। তাঁকে হাত করতে না পারলে তাঁর আগামী নির্বাচনে ভোট পাবার আশা নেই। আদমশুমারির কাজে এসেছেন স্থানীয় মৌলবীসাহেব, তার সঙ্গে মায়েলজীর এক হাত লড়াই হয়ে গেল। সহকর্মীরা তাঁকে শান্ত করেন, এত মেজাজ দেখালে ভোটারদের মন পাবেন কি করে। বিকালে তিনি গেলেন জগদ্গুরু শ্রী সহস্রানন্দের আশ্রমে ফল-পেঁড়া-সন্দেশের ভেট নিয়ে। এঁকে ধরলেই তিনি সব ভোট পাবেন। মুশকিল আসানের পথ এখানেই পাওয়া গেল। ঐ সেনসাস অফিসার মৌলবী সাহেব 'গুরুজী'কে ও গুনে ফেলেছে। তিনি তো মানুষ নন, তিনি যে দেবতা, তিনি যে ভগবান! তাঁর নামটি সেনসাস-ফাইলে মানুষের মধ্য থেকে কেটে দিতে হবে - এই আবেদন নিয়ে চরণদাসজী বিকালে যান মৌলবী সাহেবের বাড়িতে। তারই পা জড়িয়ে ধরে এই প্রার্থনা জানান। এর মধ্য দিয়ে রাজনীতিবিদ চরণদাসজী তার হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাবার সুযোগ পান। এই এম.এল.এ বা মায়েলজীদের প্রসঙ্গে রেণুর ছোটনবাবু (এম.এল.এ)দের কথা অবশ্যই মনে পড়বে ('প্রতিনিধি চিটিয়া,' গ্রন্থে আদমী- পৃঃ ১৩৭-১৪৪)।

সতীনাথ হাস্য ও কৌতুকাশ্রিত গল্পের মধ্য দিয়ে সামাজিক ত্রুটি ও রাজনৈতিক বিভ্রান্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন, একশ্রেণীর অশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা ও বিশৃংখল ব্যবস্থার দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনেছেন আরো কয়েকটি গল্পে যেমন - 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ', 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ', 'মা অমৃতলেষু' ইত্যাদি গল্পে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যখন কোন এলাকার মানুষ বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হয়, আমাদের দেশে তখন দেখা দেয় ত্রাণযজ্ঞের মহাসমারোহ। নানা উপায়ে চাঁদা তোলার ধুম পড়ে যায় কিন্তু সংগ্রহের সময় যে-উৎসাহ দেখা যায়, গৃহীত অর্থ যথাস্থানে জমা দেওয়ার সময় তা প্রায় ক্ষেত্রেই ঝিমিয়ে পড়ে। বাস্তবের এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত "তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ" গল্পটি।

সরকারী কার্যালয়ে বিশৃংখলা, ভ্রষ্টাচার স্বাধীন ভারতের অন্যতম দুরবস্থা। সতীনাথ কোনদিন সরকারী কাজ করেন নি, কিন্তু তাঁর বন্ধুস্থানীয় অনেকেই ছোটবড় সরকারী কাজ করতেন। সে জন্য সরকারী অফিসের কাজে গাফিলতির বিষয় তাঁর অজানা ছিল না। 'মা-আম্রফলেষু' গল্পে এসবেরই সত্যনিষ্ঠ ব্যঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। শ্রী আমাশা আম রপ্তানি করপোরেশন। অফিসারে অফিসারে সামান্য বিষয় নিয়ে মনকষাকষি, কাজের বালাই নেই। অফিসে এসে আম রপ্তানীর ব্যাপারে অনেকে এসে ঘুরে যায়, কর্মচারীবৃন্দের তাদের প্রতি অবহেলার অন্ত নেই। আসল কাজ এগোয় না। অফিস ঘর সংশ্লিষ্ট বাথরুমের আয়তন নিয়ে অফিসের দুই কর্তাব্যক্তির দ্বন্দ্ব। বড় সাহেব শ্রী মুখার্জী বোম্বে থেকে এলেন, বাইরে ব্যবহারে কাজে কর্মে নিয়মনিষ্ঠ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনিও এসেছেন শালীর বিয়ের উপলক্ষে এবং অফিসের পরিদর্শনের কাজ দেখিয়ে খরচ সংগ্রহ করলেন, Surprise Inspection- এর অজুহাত না নিলে সরকারী খরচে শালীর বিয়েতে আসা হত না। স্বাধীনতা-উত্তর আমাদের দেশে যে একপ্রকার সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এবং সুবিধাবাদীদের মধ্যে রাজনীতি-কর্মী ও সরকারী আধাসরকারী বেসরকারী বহু কর্মচারী দেখতে পাওয়া যায়, এই সব চরিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরন সতীনাথের গল্পে আছে।

সতীনাথ চল্লিশ দশকের সমাজজীবনের সঙ্গে অভিজ্ঞতা সূত্রে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁর মতো দেশ-কাল-ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন লেখকের পক্ষে সমকালকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সত্যনিষ্ঠা ও জীবনসন্ধিৎসায় সতীনাথ বাস্তব সচেতন লেখক। তাই স্বাধীনতার পরে

রাজনীতির জটিলতায় হতাশ হয়ে রাজনীতি ত্যাগ করে সাহিত্যে সমর্পিত প্রাণ হয়েও বাস্তব-জীবন, জনজীবন ও সমকালীন সময় নির্ভর সমাজকে কোনমতেই অস্বীকার করতে পারেননি। রাজনীতি তাঁর কাছে বহিরঙ্গ বিষয় নয়, তা জীবন প্রত্যয়ে সত্য। মানুষকে পরিপূর্ণ সত্যের আলোকে দেখা ও প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক কর্মী হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে যে মাটি ঘেঁষা সজীব মানুষগুলিকে তিনি দেখেছিলেন তাদের কথা না লিখলে যে তাঁর রাজনৈতিক জীবন পূর্ণতা পেতনা। হয়ত এ কারনেই তিনি এ সক্রিয় রাজনীতি ছাড়বার কারণ হিসেবে বলেছিলেন - 'কংগ্রেসের কাজ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল। সে কাজ তো হাসিল হয়ে গেছে। এখন 'রাজকাজ' ছাড়া কোনো কাজ নেই আর।" [৮] এই 'রাজকাজ ছিল বড়ো বড়ো কংগ্রেস কর্মীর। সেখানে সতীনাথের পক্ষে মন মেলানো সম্ভব ছিল না। তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে তিনি সরে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরও কাজ ছিল। তিনিও দায়বদ্ধ ছিলেন। তাই নতুন বানী প্রকরণে লিখলেন 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে'র দুটি চরণ। তিনি লিখেছিলেন - " আমার কাজ হলো চেনা ঢোঁড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে সে সারা দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু তার চরিত্রের মধ্যে দিতে হবে। ..... গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় ঐ শ্রেণীর লোকের চরিত্রে, যেখানে যা ভাল নজরে পড়ে ছিল, সেইসব সদগুনগুলো দিয়ে তাতমাটুলির ঢোঁড়াইকে সাজাতে আরম্ভ করলাম"। [৯] সতীনাথ আরো বলেছেন - "ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখান উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীন সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা, মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে।" [১০]

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' দেশ-কাল ও মানুষ নিয়ে লিখিত এক আধুনিক এপিক। তিরিশ বছরেরও কিছু বেশি সময়, জিরানিয়া শহরের নিকটবর্তী জনপদ, যা আসলে অনু-ভারতবর্ষ আর অনেক মানুষ - এই হলো উপাদান। সতীনাথ ভেবেছিলেন যতদিন তিনি

বাঁচবেন এদের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা তিনি এঁকে যাবেন। তার নামও ভেবেছিলেন - 'উত্তর ঢোঁড়াইচরিত' সতীনাথের অগ্রজ ভূতনাথ ভাদুড়ীর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি থেকে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুও জানা যায়। - 'তৃতীয় চরণে ঢোঁড়াই-এর স্বাধীনোত্তর রাজনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে লেখার ইচ্ছা ছিল। স্বাধীনতার পর দেশশাসনে বিশৃংখলা, আমলাতন্ত্র, সরকারি অব্যবস্থা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা, অর্থলোলুপতা, স্বার্থপরতা, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থ-হরিজন সমস্যা- যা পরবর্তীকালের তার ব্যাঙ্গাত্মক ছোটগল্পে প্রকাশ পেয়েছে - এই সবই লেখার ইচ্ছা ছিল - ঢোঁড়াই তৃতীয় চরণে'।[১১]

স্বাধীনতার পরে সতীনাথ প্রায় বছর পনেরো জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পিত তৃতীয় চরণে হাত দিলেন না। নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, ভালো বিক্রী হলে শুধু 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' কেন, 'উত্তরোত্তর ঢোঁড়াইচরিত' পর্যন্ত লিখে চলতে না ?' এই কথাটা অবশ্য হালকা চালেই বলা। কারণ তিনি জানতেন, সমকালীন সাহিত্য জনপ্রিয় হয় - যদি তার মধ্যে উত্তেজক ঘটনার বিবরণ থাকে, যদি তা পাঠকের অপূর্ণ ইচ্ছাকে কল্পনায় পূরণের সুযোগ দেয়। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'এ এই দুই লক্ষনই অনুপস্থিত। তবে কি গোপাল হালদারের সিদ্ধান্তই সত্য - 'সতীনাথ বুঝেছেন গান্ধী আন্দোলনের উত্তম পুরুষ নেই।' তাই প্রস্তাবিত 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' লেখা হয়নি। কিন্তু তাই বা হবে কেন ? যে ঢোঁড়াইয়ের বিবর্তন সতীনাথ দেখাচ্ছেন, যাকে তিনি দ্বিতীয় চরণের শেষে বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের যুবক অবস্থায় ছেড়ে দিলেন, তার ভবিষ্যৎ বিকাশ গান্ধী - আন্দোলনের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে কেন ? গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অধিকার রক্ষার নতুন নতুন আন্দোলনে সে যোগ দেবে, তার উত্তরপুরুষ যোগ দেবে। সেইভাবেই লিখিত হয়ে যাবে 'উত্তরোত্তর ঢোঁড়াইচরিত'। গান্ধী-আন্দোলন নিষ্ফল হতে পারে, কিন্তু ভারত-বর্ষীয় মানুষের প্রতিনিধি ঢোঁড়াই বা তার বংশধরেরা নিষ্ফল নয়। সুতরাং গান্ধী আন্দোলনের বন্ধ্যাত্ব বা ব্যর্থতা উত্তরোত্তর ঢোঁড়াইচরিত রচনায় সতীনাথের পথে বাধা হতে পারে না। বাধা ছিল নিজের অপর্যাপ্ততার মধ্যে (" এত সব করে, শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই-এর চরিত্র যা দাঁড়াল তাতে আমি মোটেই তৃপ্তি পাইনি। চেষ্টার ত্রুটি আমার ছিল না, কিন্তু যে বিশালতা ও গভীরতা দিতে চেয়েছিলাম সে চরিত্রে, নিজের অক্ষমতার জন্য তা দিতে

পারিনি। ঢোঁড়াইদের চরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম এক গণ্ডূষ গল্পের মধ্যে ধরতে পারিনি। একসময় ভেবেছিলাম যতকাল বাঁচব ঢোঁড়াইদের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকে যাব। মনে মনে এর পরের খণ্ডের নাম হবে ঠিক করেছিলাম 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত'। এ বিষয়ে নিজের অপর্যাপ্ততা ভালভাবে বোঝবার পর সে সংকল্প ছেড়েছি।"[১২]

ঢোঁড়াই-চরিত্রের শিকড় ভারতের গ্রামজীবনের গভীরে প্রোথিত। তারাশংকর - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট চরিত্র, প্রেমচন্দ বা গোপীনাথ মহান্তির সৃষ্ট চরিত্র যেমন গ্রামজীবন ও সমাজের গভীরে প্রোথিত, সতীনাথের ঢোঁড়াইচরিত মানসের চরিত্রগুলি তেমনি প্রোথিত। বরং সতীনাথের এই উপন্যাসের শিকড় চলে গেছে আরো গভীরে - ভারতের মানসিকতার মর্মমূলে।

সতীনাথ তিরিশ সাল থেকে দশ-বারো বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তাকেই জারিত করে তার পক্ষে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' লেখা সম্ভব হয়েছিল। লাডলীবাবু, অযোধিয়া চৌধুরী, চরণদাসরা ক্ষয়তাসীন হবার পর, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র বঞ্চনা যেভাবে তীব্রতর হয়েছে - 'সেই পরিবর্তনের চেহারা স্পষ্ট রূপ নিতে বছর দশেক সময় লেগেছে। সতীনাথের হাতে সময় ছিল না। সেই পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে খানিকটা সময়গত দূরত্বের নিরাসক্তি দিয়ে তাকে তিনি রূপায়িত করার সময় পাননি। এই সময়গত দূরত্বের অভাবকেই তিনি অপর্যাপ্ততা' বলেছেন, বলে মনে হয়।"[১২] সতীনাথের যাঁরা সাহিত্যিক উত্তরপুরুষ তাঁদেরই দায়িত্ব ছিল সেই 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' বা উত্তোরোত্তর ঢোঁড়াই চরিত' রচনার।

'উত্তরঢোঁড়াই চরিত' - স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের স্ফুট রূপ ও 'ময়লা আঁচল'

ফণীশ্বর নাথ রেণু'কে সতীনাথের সাহিত্যিক উত্তর পুরুষ বললে অসঙ্গত হবে না। গুরু ও শিষ্য প্রতিম এই দুই লেখকের 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' উপন্যাস

দুইটি যেন একটি অপরটির পরিপূরক। স্বাধীনতা লাভের পর যে অবক্ষয়ের সূচনা দেখেছিলেন সতীনাথ রেণু তা আরো বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষ করে তাঁর রচনায় স্থান দিলেন। সতীনাথের 'উত্তর ঢোঁড়াইচরিত' লিখবার পরিকল্পনার কথা তিনি জানতেন। হয়ত 'গুরুজী' প্রদর্শিত পথ তাঁকে আলোড়িত করেছিল, এ বিষয়ে লিখবার প্রেরণা দিয়েছিল।

'ঢোঁড়াইচরিত মানস'র দ্বিতীয় চরণ পর্যন্ত যে সামাজিক বাস্তবতা ও পরিবর্তনের ছবি সতীনাথ আঁকলেন, সেই ধারাকে অক্ষুন্ন রাখলেন রেণুজী তাঁর রচনায় বিশেষ করে 'ময়লা আঁচলে'। স্বাধীনতা পরবর্তী বাস্তবতা 'ময়লা আঁচলে' যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা যেন 'উত্তর ঢোঁড়াইচরিত' এর কাংখিত বাস্তবতা। কালগত দিগ থেকেও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' যেখানে শেষ হয়েছে 'ময়লা আঁচল' সেখানে শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভারতীয় বাস্তবতা অংকনে এই দুটি উপন্যাসের সহবস্থান এক নতুন বলিষ্ঠ পথ নির্দেশক। 'ময়লা আঁচল'কে সতীনাথের 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' বললে অত্যুক্তি হয় না। যে ভারতীয় বাস্তবতা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'কে বিশিষ্ট করেছে তার উত্তরাধিকারের অভিজ্ঞান 'ময়লা আঁচলে' আমরা খুঁজে পাই।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ভারতবর্ষের স্বরূপকে সত্যিকারের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত করায় যাঁরা সফল হন ফণীশ্বর নাথ রেণু তাঁদের অন্যতম। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এ আমরা যে পরিবর্তন, প্রচলিত মূল্যবোধের বিরোধিতা ও অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলায় সংগ্রামী মানুষের ছবি দেখি, তারা রেণুর সাহিত্যেও এসেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন পরিবর্তন

ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব ক্ষেত্রে কৃষক আন্দোলন, অসহযোগ, ১৯৪২ এর ভূমিকারী তুফান গ্রামকেও আলোড়িত করেছিল। স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক ভাবেই সেই আলোড়ন গ্রামবাসীর চেতনায় জাগরণ হয়ে এল। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার

মধ্যে এবং আরো অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে সে জাগরণের লক্ষন পরিস্ফুট হতে লাগল। রেণুর রচনায় এই যুগ পরিবর্তনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রেষচন্দের গ্রামের যে ভূস্বামী বা সামন্ত শ্রেনীরা ছিল, তারাই স্বাধীনতার পর, সময়ের সাথে সাথে নিজেদের কে পরিবর্তিত করে হলেন পঞ্চায়েত প্রধান, মিউনিসিপ্যালিটি বা বোর্ডের চেয়ারম্যান কিংবা এম-এল-এ ইত্যাদি। এই পরিবর্তনের সূচনা আমরা 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে' দেখেছি, কিভাবে স্বাধীনতার পর গ্রামাঞ্চলে পরিবর্তন এলো - লাডলীবাবুরা ক্ষমতাসীন হলো, রেণু এই পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে তার ছবি আঁকলেন 'ময়লা আঁচল' ও অন্যান্য রচনায়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরও কিন্তু প্রজা-জমিদার সম্পর্কের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা প্রচুর রয়ে গেল। আইনতঃ প্রজার অধিকার স্বীকৃত হলেও, কার্যতঃ জমির মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেল। জমির প্রকৃত মালিকানা কার ? এই অধিকারের প্রশ্নটিকে রেণু অত্যন্ত জোরালোভাবে তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত করলেন।

স্বাধীনতার পরে গনতন্ত্রের প্রয়োগে নিরত রাজনীতি কতদূর পর্যন্ত আমাদের জীবনকে সংকটময় করে তুলেছে তার স্বরূপ আমরা সতীনাথের রচনাতে পাই। 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে'র পর তিনি এই চিত্র আর আঁকেননি। রাজনীতি থেকে বিদায় নিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির কিছু চিত্র আমরা তার ছোটগল্পে পাই, ঢোঁড়াইচরিত মানসের মত বড় ক্যানভাসে তিনি কিছু আঁকলেন না। কিন্তু রেণু আমৃত্যু রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। ১৯২০'র রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সত্তরদশকের রাজনীতি পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত। 'ময়লা আঁচল' থেকে 'পল্টুবাবু রোড' পর্যন্ত এই রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রবাহের চিত্র তিনি সযত্নে এঁকেছেন।

রেণুর সাহিত্যে স্বাধীনতা পরবর্তী আর একটি বড় উপলব্ধি শহরের চাপ থেকে বাঁচবার জন্য গ্রামের দিকে যাবার সূত্রও গ্রাম ও শহরের নয়া যোগবন্ধন - "শহর-গাঁও কে মিয়ে সমীকরণ কী এক তস্বীর 'মৈলা আঁচল' যে তী হ্যায়, পর উহ অসহযোগ যুগ

কী তস্বীর সে ভিন্ন হয়। অসহযোগ যুগ মে কার্য-কর্তাও সে ইহ সেতু বনতা থা। আগ্রাদী কে সাথ নয়ে সেতুবাসী তত্ত্ব উৎপন্ন হুএ। হাস্পাতাল, সংচার কে মার্গ, অঞ্চল বিকাশ পরিযোজনাএঁ আউর পঞ্চবর্ষীয় যোজনাএঁ নয়ে তত্ত্বোকে সাথ গাঁও মে প্রবেশ কর রহে থে। জংগলো পর সরকারী নিয়ন্ত্রন হোনে জা রহা থা। ইসনে গাঁও কী জড়তা কো তোড়া থা। শিক্ষা কে নয়ে আধার অবশ্য গাঁও কী শক্ল কো বদলনে মে ভীতর সে প্রভাবকারী হো রহে থে। এক প্রকার কা জনতন্ত্র ইনকে সাথ ভী জুড়া থা। পর ইস জনতন্ত্র কে সায়ে মে অন্য সাম্প্রদায়িক শক্তিয়াভী পনপ রহী থী। উনকে লিএ দেশ কা ভবিষ্য ধর্ম-সম্প্রদায় কে ভবিষ্য কে বাহর ন থা। ইস প্রকার লোকস্তর পর কই বিচার ধারাএঁ এক সাথ সক্রিয় হো রহী থী।" [১৪]

আর্থিক পরিবর্তন

সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে আর্থিক ব্যবস্থা। স্বাধীনতার পূর্বে বিদেশী শাসক আর্থিক শোষন করেছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারনের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাধীনতা লাভের পর সরকার পঞ্চবর্ষীয় যোজনার পরিকল্পনা নিলেন। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ। পরাধীন ভারতে কৃষি প্রধান ভারতবর্ষের গ্রামগুলির অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ও সংস্কার ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর জন্য স্বাধীন সরকার কৃষি ও গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক পরিকল্পনা গ্রহন করলেন। সামুদায়িক বিকাশ যোজনা, ভূমি সংস্কার, জলসেচ ইত্যাদি। গ্রামের বেকারত্ব, দারিদ্র দূরীকরনের জন্য কুটীর শিল্প প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হল। কৃষির বিকাশের জন্য, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, ভালো বীজ সারের বন্দোবস্ত, ভূমি পরীক্ষা, জমি চাষ, ফসল বোনা, কাটার জন্য যন্ত্রপাতির সহায়তা নেওয়া ইত্যাদি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে গ্রামীন আর্থিক বিকাশে আশা জাগিয়ে ছিল।

কিন্তু এই সুবিধাটুকু সাধারনের নাগালের মধ্যে এল না। সমাজের মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণী, স্বার্থবাদী রাজনীতি, সমাজের সম্পন্ন মানুষজন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের

ভ্রষ্টাচার, দরিদ্রের দারিদ্র্যকে আরো বৃদ্ধি করল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী তথা গ্রাম-বাসীর অভাব মিটলো না। স্বাধীনতার পূর্বে তাদের জীবনে যে অন্ধকার ছিল, স্বাধীনতার পরেও তা বহাল রইল। শোষনকারীর চেহারার পরিবর্তন হল মাত্র কিন্তু শোষন পূর্ববৎ রইল। এই নতুন আর্থিক স্থিতি সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। রেণু এই স্বাতন্ত্র্যোত্তর নয়া আর্থিক স্থিতির প্রভাব সমাজ জীবনে বিভিন্ন বর্গের মানুষের উপর কিভাবে পড়ল তা তাঁর কথা সাহিত্যে অত্যন্ত সজীবভাবে রূপায়িত করলেন। স্মরণ করা যেতে পারে এই নতুন সামাজিক অবস্থার চিত্রন করতে চেয়েছিলেন সতীনাথ তাঁর 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত মানসে'। রেণু এই পরিকল্পনার কথা জানতেন। গুরুজীর অসমাপ্ত বাসনার চিত্রায়নে রেণু সমর্থ ছিলেন। তাই যে সামাজিক অবস্থার প্রারূপ 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' পরিস্ফুট হচ্ছিল, তাকে তিনি নিজস্বদৃষ্টিকোন থেকে অধিকতর পরিস্ফুট করে, এই সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে তাঁর রচনার আধারে স্থান দিলেন, এবং ভারতীয় সাহিত্যে যথার্থতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।

ময়লা আঁচল(রচনাকাল : ১৯৫৪) উপন্যাসটির কথাবস্তুর শুরু ১৯৪৬ থেকে। শেষ ১৯৪৮ এ গান্ধী হত্যার পর পর্য্যন্ত। এই উপন্যাসে স্বাধীনতা লাভের পূর্বকাল ও স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী বছরের ছবি অংকিত। পরাধীন ভারতবর্ষে বড়কোন যোজনার প্রয়াস ছিল না। কিন্তু কংগ্রেসীরা ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে আর্থিক দিক থেকে সুদৃঢ় করে তুলবার জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর প্রেরণায় বহু গ্রামে কুটির শিল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রেরণারই পরিনাম মেরীগঞ্জ গ্রামে চর্খা সেন্টার খুলবার উদ্যোগ। 'ময়লা আঁচল'এ শিবনাথ চৌধুরী এই উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য বলেন - 'চর্খা সেন্টার খুল গয়া হ্যায়। অব গাঁও মে গরীবী নহী রহেগী। পটনা সে দো মাষ্টর আএ হ্যায় - চর্খা মাষ্টর আউর করধা মাষ্টর। এক মাষ্টরনী ভী আই হ্যায় - আউরতো কো চরধা শিখানে কে লিএ। আউরতো মে কহতী হ্যায়, চরধা হমারা ভতার পুত, চরধা হমার মাতী, চরধা কে বদৌলত মোরা দু অন্ন জুলে হাথী।" [১৫]

মেরীগঞ্জ গ্রামে চর্খা সেন্টার খোলা গ্রামীন ভারতবর্ষে কুটির শিল্প উদ্যোগের প্রাথমিক চরণ। এই সব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এটুকু উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে দেশ-নেতারা গ্রামবাসীর আর্থিক উন্নয়নের কথা ভেবেছেন। পাশাপাশি এই সত্যেও আমরা পৌঁছে যাই যে স্বাধীনতা লাভের পর, গান্ধীজীর মৃত্যুর পর দেশনেতাদের মধ্যে ভ্রষ্টাচার তীব্র আকার ধারন করল। মেরীগঞ্জ গ্রামে কংগ্রেসী নেতা বালদেবের কুকীর্তি, সৎ নিষ্ঠাবাণ বামনদাসদের মত রাজনৈতিক কর্মীদের তীব্র হতাশা, কালীচরণদের মত অজ্ঞ গ্রামবাসীর বিসঙ্গতিময় রাজনীতি। বিশ্বনাথ প্রসাদদের মত নতুন ধনিক শ্রেণী ও দুলার চন্দ্র কাপড়া ও সাগরমলদের মত চোরাকারবারীদের অঞ্চলের নেতা বনে যাওয়া। এ সবই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রামগুলিতে উন্নয়নের বদলে নিয়ে এল তীব্র হতাশা। গ্রামবাসীর দুঃখ দুর্দশা অভাব মোচন আর হল না।

রেণুর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পরতি পরিকথা' তেও আমরা দেখেছি, পরাণপুর গ্রামের জন্য অনেক যোজনা নেওয়া হয়েছে। সরকার এবং জনতা উভয়েই গ্রামীন অর্থনৈতিক বিকাশে সক্রিয় অংশ নিয়েছে। কোসী বাঁধ যোজনা এর স্পষ্ট প্রমাণ। পতিত জমি সংস্কারে, গ্রামের কৃষকদের নতুন আশার সঞ্চার, সবই স্বাধীনতার পরবর্তী চিত্র। এই অগ্রগতির কাছে, গ্রাম্য নেতাদের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি দলাদলি যে অনেক উন্নতির অন্তরায় এই ছবিও রেণু এঁকেছেন। "........... ম্যায়নে পরতিঃ পরিকথা লিখনী শুরু কি । মেরে মিত্রো নে জব উসকে কুছ হিস্সে সুনে, তো কহনে লগে কি ইহ তো রূপ কা লেখক হো গয়া। ইহ তো পঞ্চবর্ষীয় যোজনাও পর লিখনে লগা হ্যায়। ইহ নবনির্মান কী বাত করনে লগা হ্যায় ....।" ১৬

" ....'পরতী পরিকথা'মে ম্যায়নে জমীন, ভূমিহীনো আউর খেতিহর মজদূরী কী সমস্যা কো লেকর বাতে কী। জাতিবাদ, ভাই-ভতীজাবাদ আউর ভ্রষ্টাচার কী পনপতী বেল কী আউর মাএ ইশারা নহী কিয়া থা, ইসে সমূল নষ্ট করনে কী আবশ্যকতা পর ভী বল দিয়া"১৭।

গ্রামীন অর্থনীতিতে 'কুটির শিল্প' ও ছোট ছোট কারিগরী শিল্প নতুন দৃষ্টি খুলে দিচ্ছে। রেণুজীর 'জুলুস' উপন্যাসে দেখি - গ্রামের মুখিয়া তালেবর গোড়াঁর ধান কোটার মেশিনের চুত-চুত আওয়াজ তার মধ্যে অদ্ভুত ভাবে সাড়া জাগাচ্ছে। জল সেচের ক্ষেত্রেও দেখি নবীন আশা। ময়লা আঁচলে দেখি তহসীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদ তার কৃষিকাজে জলসেচের জন্য পাম্পসেট নিয়ে এলে সুমরিত দাস উল্লাসের সঙ্গে বলে - "পাণী কা পম্পু আবেগা। ইন্দর ভগবান কী খুশামদ কী জরুরত নহী। কমলা নদী মে পম্পু লগা দিয়া, মিসিন ইসটার্ট কর দিয়া আউর হথিয়া শূন্ড কী তরহ সব পাণী সোখকর খেতে পটর দেগা।" এ ছাড়াও কোসী যোজনা করে পতিত জমি উদ্ধার, কৃষিতে গতি আনবার জন্য ট্রাক্টরের ব্যবস্থা, ভূমি ক্ষয় রোধ, ভূমি পরীক্ষা, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ সবই কৃষিপ্রধাণ ভারতবর্ষে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

কিন্তু এই সুযোগ সুবিধা বিশ্বনাথ প্রসাদ(ময়লা আঁচল) জিতেন্দ্র(পরতি পরিকথা)র মত বড় কৃষকরাই পেয়েছে। সতীনাথ বলেছিলেন - "আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক চাষবাস করে খায়। তাই গোরুর গাড়ি-চালক ঢোঁড়াইকে যৌবনে তাতমাটুলি থেকে সরাতে হল চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্য।"[১৮](সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২ খন্ড। পৃ: ৪১১) বিসকান্ধা গ্রামে ঢোঁড়াইএর পরিচয় হলো ভারতবর্ষের প্রধানদুটি জমিকেন্দ্রিক শ্রেণীর সঙ্গে। একদল লোকের অল্পজমি কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, অপরদলের বহু জমি এবং তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চক্রবৃদ্ধি ঋণের জালে আটকে দরিদ্র মানুষগুলির জমি নিজের সীমানাভুক্ত করে তাদের ভূমিদাস করে ফেলতে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এর ভূস্বামী বচন সিং এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। এ ছাড়াও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'আন্টাবাংলা' গল্পে ও রেণুজীর 'পরতি পরিকথা' উপন্যাসে নীলকর সাহেবদের অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস দেখি, এদের জমি সম্পত্তি যখন দেশীয় নব্য ধনিক সম্প্রদায়ের হাতে হস্তান্তরিত হল তখন আর এক শ্রেণীর জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সবারই লক্ষ্য ছিলো যেনতেন প্রকারেন জমি বাড়ানো, রেণুজী অংকিত 'ময়লা আঁচলের' বিশ্বনাথ প্রসাদ, 'পরতি পরিকথা'র

জীতেন্দ্রর বাবা পৃথ্বীধরা। সতীনাথ-এর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' অংকিত বচন সিংহের
ছোট কৃষক বা ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে প্রচের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। সময়ের পরিবর্তনে তা হয়েছে।
বলা বাহুল্য তা হয়েছে 'ময়লা আঁচলে'র কালীচরণ, বীরসা মাঝিরা তা করেছে।
'ময়লা আঁচল' 'পরতি পরিকথা' এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির ঐতিহাসিক দলিল। ভূমি সমস্যা
কৃষি প্রধাণ ভারতবর্ষের একটি বড় সমস্যা। ভূমিহীন আদিবাসী সাঁওতাল কৃষক, অল্পজমির
কৃষক আবার কয়েক হাজার একর জমির মালিক ও কৃষক' এই সব কৃষকদের বর্গও ও শ্রেণী
চরিত্রের সজীব উদাহরণ আছে এই উপন্যাস দুটিতে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় কৃষি ও
ভূমি ব্যবস্থার পুর্ণগঠন এবং সকল ধরনের কৃষকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চিত্র এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ
কৃষকদের বাস্তব অবস্থা কি ? সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের কি পরিবর্তন ঘটছে
তার অনবদ্য বিশ্লেষণ রয়েছে এই উপন্যাস দুটিতে। একদা বিসকান্ধার মত কৃষিপ্রধান
গ্রামে 'ঢোঁড়াই'এর মাধ্যমে যে জনচেতনার জাগরণ দেখেছিলাম তা স্বাধীন ভারতবর্ষে কি
তাৎপর্য্য বয়ে আনল তা এই উপন্যাস দুটিতে লক্ষনীয়।

স্বাধীনতার পর রাস্তাঘাট যানবাহনের কিঞ্চিৎ উন্নতি হবার সাথে সাথে এক
ধরনের মজুতদার শ্রেণীর উদ্ভব হল। প্রধান কৃষিদ্রব্য ছাড়াও শাকসবজী ইত্যাদি উৎপন্নকারী
ছোট ছোট কৃষকরা সম্প্রসারিত বাজারের সুযোগ নিতে পারল না। তারা গ্রামের মহাজন,
দালাল, ফড়ের কাছে কমদামে মাল বিক্রী করতে বাধ্য হল। ফলতঃ বড় কৃষক(ময়লা আঁচলে
বর্ণিত বিশ্বনাথ প্রসাদ, রাম খিলাওন যাদব, রামকৃপাল সিং) রাই পেল সুবিধা।
মজুতদাররা পেল প্রশ্রয়।

গ্রামে মুক্তি-রোজগারের অভাব ক্রমাগতঃ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, কম মজুরীতে
মজুর খাটানো বাড়তে লাগল। বস্ত্র সমস্যার দুঃস্থ চিত্রও পাই 'ময়লা আঁচলে'। বেশীর
ভাগ গ্রামীণ পুরুষই অর্ধউলঙ্গ থাকত, কেউ কেউ আবার কাপড়ের দাম বেশীর জন্য হাফ
প্যান্ট পরা শুরু করেছে। বছর বারো পর্যন্ত বালকেরা উলঙ্গ থাকত। মহিলারা কোমরের

নীচ থেকে বুক পর্যন্ত এক আলি কাপড়ের আলি দিয়ে জড়িয়ে রাখত। বলদেবের মত নেতারা রেশনে ও সরকারী সহায়তার কাপড় কালোবাজারে চালান করে দিত। 'যমুনা আঁচলে' এসব চিত্র আছে।

গ্রামের সমৃদ্ধশালী মানুষেরা দরিদ্র গ্রামবাসীদের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা না করে তাদের শোষণ করত। জীবিকা উদরান্ন জোটানোর কঠিন পরিশ্রম করতে করতে গ্রাম-বাসীর মনে বিবিধ প্রতিচিন্তার জন্ম হয়। শোষণকারী উচ্চবর্গের প্রতি নানাভাবে প্রতিবাদ জানাতে চায়। সহজ-সরল জনতার মধ্যে অদ্ভুত প্রতিবাদ জাগে। 'যমুনা আঁচলে' দেখি কালীচরণ ঘোষণা করছে - "তন্ত্রিয়া টোলার কোন স্ত্রীলোক বাবুটোলায় কাজ করতে যাবে না। কোনো বাবুটোলার লোক তাদের বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।" অভাবের জন্য অনেক সামাজিক নিয়ম শিথিল হয়ে যায়। অভাবগ্রস্ত নিম্নবর্গের স্ত্রীরা বিত্তবানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। অনেক সময় বিত্তবানের দৈহিক পিপাসা চরিতার্থ করতে রাত্রী হয়ে যায়। এই সামাজিক পাপ দীর্ঘকালের, কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নতুন চেতনার। এই নতুন চেতনার একটি সাদৃশ্যমূলক ঘটনা 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'ও আছে। হয়ত এই দুই লেখক উত্তর বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাজনীতি করবার সময় একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন - "বিন্টা বলে, আসল কাজের কথায় এস 'মড়র'। আমি চাই আজের তরফ থেকে আমাদের মেয়েদের রাজপুতদের বাড়ি কাজ করা বন্ধ করে দাও। শৈতা নেওয়ার পর থেকে কুশবাহা ছত্রী মরদরা রাজপুতদের বাড়ীর এঁটোকাঁটার কাজ বন্ধ করে দিল। তবে মেয়েরা করে কেন সে কাজ এখনও ? আমাদের টোলার তিন-তিনটে মেয়ে বিয়ের পরও শ্বশুর বাড়ি যায় না। সেখান থেকে নিতে এলেও তাদের বাপ-মা 'রোকশাদি' করায় না। কেন শুনি ? পরগনা সুদ্ধু লোক একথা জানে। আমার সাফ-সাফ কথা রাজপুতদের বাড়ি দাইয়ের কাজ করা বন্ধ করে দাও। ঘরের বেড়াল মেয়ের ছবি টাঙিয়েছে লছমনিয়া, শেল কোথা থেকে ?

তুলকালাম আরম্ভ হয়ে যায় মঠের মাঠে। বুড়হাদাদু ঠকঠক করে কাঁপে। হল কী কালে কালে! এখনও তবু তার ছেলের বৌটা রাজপুতদের বাড়ি কাজ করে যাহোক দুমুঠো খেতে পাচ্ছে! 'নিজেদের গায়ে কুড়ুল মারিস নারে বিন্টা। তবে হ্যাঁ, যে মেয়েদের বয়স

কয়, তাদের জন্য একটা নিয়ম করলে হয়।" ১১

('ঢোঁড়াই চরিত মানস' : দ্বিতীয় চরণ)

সতীনাথ গ্রন্থাবলী - ২ পৃ ১৯১

ভারতবর্ষে অনাদিকাল ধরে জমির সঙ্গে কৃষকের অবিচ্ছিন্ন যোগ, জমির প্রতি তার নাড়ীর টান। নানারকম মূল্যবোধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন তারা। জমিদারী শোষনে ভূমিহারা হলেও গ্রামের চাষী ভিটে-মাটি ছেড়ে কলে-কারখানায় কাজ করার জন্য শহরে আসতে কিছুতেই রাজী হল না। অজানা শ্রমিক - জীবন সম্পর্কে তাঁদের কতকগুলি আজন্ম-লালিত বদ্ধমূল সংস্কার রয়েছে, যা থেকে তাঁরা কিছুতেই মুক্ত হতে পারেন না। তবুও তাঁদের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে গ্রাম ছাড়তে হয়, শহরের কারখানায় আসতে হয়। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে খনি-বাগিচা, কলকারখানায় গ্রামীন মানুষরাই ভীড় করেন, গ্রামের কৃষক কারখানার শ্রমিকে পরিণত হন, শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ান। রেণুজী তার 'ময়লা আঁচলে' শ্রেণী-রূপান্তরের এই ঐতিহাসিক নিয়মটি লক্ষ করেছিলেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে গ্রামীন অর্থ-নীতির ভয়ংকর বিপর্যয়ই যে ভারতের শ্রমিক-সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, রেণু এই অর্থবহ সমাজ-তাত্ত্বিক সংকেত তাঁর কথা সাহিত্যে বার বার দেখিয়েছেন।

'কাটিহার মে এক জুট মিল আউর খুলা হ্যায়। তীন জুট মিল ? চলো দো রুপয়া, মজদুরী মিলতী হ্যায়। গাঁও মে অব ক্যেয়া রখা হ্যায় ....।' 'ময়লা আঁচলে' সুমরিত দাসের এই কথায় গ্রামের কৃষিজীবির শহর অভিমুখী হবার চিত্র ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে ভারতীয় কৃষকের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি।

'ময়লা আঁচলে' রেণু দেখিয়েছেন কেমন করে ছোট কৃষকের জমি বড় জমিদারের হাতে চলে যায়। জমি দখলের লড়াইতে নিঃস্ব ভূমিহীনরা লড়াই করে পর্যদুস্ত হয়, তাদের সহযোগিতা করতে কেউ এগিয়ে আসেনা। বিত্তবান জমিদারই আইন-আদালত, থানা-পুলিশের সাহায্য পায়। রেণু চিত্রিত করেছেন উত্তর বিহারের অনগ্রসর গ্রামবাসীদের। যারা কূপ-মন্ডুকতায় আচ্ছন্ন, দলাদলিতে আবদ্ধ কুসংস্কার-গোড়ামীতে যাদের চেতনা সংকীর্ণ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রামে গ্রামে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা চলছিল। রেণুর 'পরতী পরিকথা'তে জমিদারী প্রথা উন্মীলনের সাথে সাথে অনেক ভূমিগত বিসঙ্গতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রামের তৃতীয় শ্রেণীর জমিদারের পাঁচশো বিঘা জমি দখলে এরাও নিজেদের কৃষক বলে দাবী করেন। বড়ো জমিদারদের তো কথাই নেই পূর্ণবাবু দশহাজার বিঘা জমির মালিক। ভোলাবাবু পনের হাজার বিঘা জমির সাথে দেড় ডজন(১৮) ট্রাকটরের মালিক। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হলেও কিসান নামধারী জমিদারদের ফসল কাটবার সময় লড়াই-দাঙ্গা-খুন প্রতিবছর হতো। গ্রামে ল্যান্ড সার্ভে নতুন সমস্যা তৈরী করল, বিভিন্ন বর্গের মধ্যে জমির অধিকার নিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। গ্রামজীবনে জমিকে কেন্দ্র করেই সব। কৃষিবিকাশের জন্য ভূমি সংস্কার প্রয়োজন। 'পরতী পরিকথা'র পরানপুর গ্রাম ছয় মাসের মধ্যে পাল্টে যায়। ভাই-ভাই, পিতা-পুত্র জমির অধিকার নিয়ে সবার সম্পর্কে ফাটল ধরে। জমিকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের টানা পোড়েন, বিভিন্ন মাণবিক সমস্যার অনবদ্য দলিল পরতি পরিকথা। কৃষিপ্রধাণ ভারতবর্ষের সজীব চিত্র এই উপন্যাস।

রাজনৈতিক পরিবর্তন

১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পপতি বুর্জোয়া, জমিদার, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক নির্বিশেষে সকলেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে রজনী পাম দত্ত তাঁর 'আজিকার ভারত'(২য় খন্ড - পৃঃ ১৭৪) এ লিখেছেন - "অসহযোগ আন্দোলন শহরগুলির নিম্নশ্রেণীর লোকসমূহকে আংঘাতিক ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ..... কোন কোন অঞ্চলে কৃষকরাও সংগঠিত হইয়াছে, বিশেষতঃ আসাম উপত্যকা, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলার কোন কোন অংশে।" [২০] সতীনাথ 'ঢোঁড়াইচরিত মানস', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাস দুটিতে এই আন্দোলনের পটভূমিকায় গ্রামীণ কৃষিজীবি মানুষদের উপস্থিত করেছিলেন। রেণুজীর 'ময়লা আঁচল' ও 'পরতি পরিকথা'য় এদের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। রেণুজী এই দুটি উপন্যাসে দেখিয়েছেন, গ্রাম-জীবনে বিদেশী বনিক-স্বার্থের প্রধাণ রক্ষক হল ভূস্বামী শ্রেণী। সুতরাং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

করতে হলে ভূমধ্যশ্রেণীকে আঘাত করতে হবে। তাই অসহযোগ আন্দোলনে যখনই কৃষক-সমাজ অংশ গ্রহন করেছেন, তখনই তা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। প্রেমচন্দের পর, সতীনাথ, রেণু ভারতীয় কৃষকদের জীবন্ত দলিল রেখে গিয়েছেন তাঁদের কথা সাহিত্যে।

দ্বন্দ্ব : গ্রাম ও শহর

গ্রাম ও শহর ভারতের গণজাগরণের দুই কেন্দ্র। ভারতবর্ষ যে গ্রাম ও শহরের অখন্ড সমীকরণ একথা রেণু বার বার তাঁর কথা সাহিত্যে উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রীকরণের ফলে যে সংস্কার দেখা দিল তাতে গ্রাম ও শহরে ব্যবধান রচিত হল। শহরের সীমানার বাইরে যে ভারতবর্ষ তার আত্মিক যোগ রইল না শহরের জীবনযাত্রার গতিবেগ ও তীব্রতা মানুষকে তার পূর্বতন সংস্কার আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আত্মসুখ পরায়ণতার পথে। গ্রামীন সভ্যতা, শহরে সভ্যতা, শিক্ষিত ও ইংরেজি অশিক্ষিত সম্প্রদায় - এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলল। ক্ষমতা, উন্নয়ন, সুযোগসুবিধা, অগ্রগতি ক্রমশঃ গ্রামের তুলনায় শহরে কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে ক্ষমতা লিপ্সু একটি শ্রেণী গ্রামের সোপানে পা রেখে শহরে ভীড়লেন। পুরানো ভূস্বামীরা শহরে আসতে লাগল নতুন ক্ষমতা লাভের আয়োজনে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' এই নব্য শ্রেণীর চেহারা, এই পরিবর্তনের সূচনা চিত্রিত হয়েছে।

"..... লাডলী বাবুটা চেয়রমেন হবার পর থেকে বাড়ি আসা আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেসি চেয়ারম্যান, খাটুনি বেশি। ..... শোনা যাচ্ছে লাডলীবাবু তাঁর স্ত্রী পুত্র নিয়ে যেতে চান সদরে। বলেছেন যে নইলে তাঁর ছেলেদের লেখাপড়া হবে না। প্রকান্ড জিলা ইস্কুল আছে সেখানে, বাবু সাহেবও দেখেছেন। রাজপার ভাতার জমিদারের ছেলে পড়ে নাকি সেই স্কুলে। তাদের পড়ারই যুগ্যি পেলায় মহল, সদর কলক্টরি থেকেও বড়।হাঁ, বড় হয়েছ, চেরমেনসাহেব হয়েছ তোমার ছেলে তো আর তোমার মত মজকুরি সেপাইয়ের ছেলে নয়। পড়াতে হবে বৈকি তাদের রাজরাজড়ার ইস্কুলে। কিন্তু বউ নিয়ে যাওয়া ? কভী নহী। চন্দাবৎ রাজপুতের বাড়ির বউ গিয়ে থাকবে নিজের সংসার ছেড়ে

সেইখানে। লোকে থুতু দেবে না তাহলে বাবু সাহেবের গায়ে ...." [২১]

যমুনা আঁচলের বায়ন দাস আক্ষেপ করে বলেছেন - "হাল ক্যা শুনিএগা, ... শিবনাথ বাবু আয়ে হ্যায় ঘটনা সে। .... ঘলাং কড়ী ঘরান্তী (প্রান্তীয়) সভাপতি হো গয়ে হ্যায়, উহ ভী ঘটনা মে হী রহেঙ্গে। .... সব আদমী অব ঘটনা মে হী রহেঙ্গে। মেলে (এম.এল.এ) লোগ তো হমেশা ওহী রহতে হ্যায়। ..... সুরাজ মিল গয়া, অব ক্যা হ্যায়।" [২২]

গ্রাম থেকে নগর অভিমুখী হবার যে সূচনা সতীনাথ দেখিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি তাঁর কথা সাহিত্যে তেমন জোরালো চিত্র আঁকেননি। 'চরণদাস' এম.এল.এ তে" খানিকটা ব্যাঙ্গছলে একদা গ্রামবাসী চরণদাসের এম.এল.এ হবার পর, দীর্ঘ দিন শহরে থাকবার ফলে গ্রাম ও গ্রামবাসীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা এবং পরবর্তী নির্বাচনে আবার গ্রামবাসীর সাথে সংযোগকরনে সমস্যার কৌতুকপ্রদ চিত্র তিনি এঁকেছিলেন। সতীনাথের এই চরণদাস এম.এল.এর সাথে রেণুর ছোটনবাবু এম.এল.এর সাদৃশ্য আছে।

ভারতবর্ষ যে গ্রাম ও শহরের অখণ্ড সমীকরণ একথা রেণু বার বার তাঁর সাহিত্যে বলেছেন। তিনি গ্রাম ও শহরের সমীকরণ করতে চেয়েছেন। গ্রামের মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন প্রগতি চিন্তা। এর জন্য শহরের মুক্ত মনের মানুষদের তিনি নিয়ে গিয়েছেন গ্রামে। রেণুজীর এই ধারার চরিত্র ডাঃ প্রশান্ত (মমুলা আঁচল) জীতেন্দ্র (পরতি পরিকথা) পবিত্রা (জুলুস) বিজয়াদি (বিরটন কে এক ফন) প্রমুখ চরিত্ররা। শহরের চাপ থেকে বাঁচবার জন্য গ্রামের দিকে যাবার সূত্র রেণু তাঁর সাহিত্যে বার বার সন্ধান করেছেন। গ্রাম ও শহরের বিসঙ্গতিময় সম্পর্ক নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের ভারতের স্বরূপকে চিত্রিত করলেন তিনি।

স্বাধীনতা পূর্ব থেকেই গ্রাম ও শহরের জনতার মানসিকতার বিস্তর পার্থক্য ছিল। শহরের জনতার মানসিকতা বিস্তৃত এবং জানাশোনার জগৎ ও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার

পরে কিছু কিছু বিষয়ে গ্রাম ও শহরের জনতার মানসিকতায় ভেদ রইল না। স্বাধীনতা পরবর্তী গ্রামজীবনে যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল রেণু তা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। নতুন নতুন গ্রামোন্নয়নের প্রভাব ও গ্রামবাসীদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া। কোসী যোজনা বিহারের কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিজীবিদের মধ্যে যে পরিবর্তনের প্রবাহ বয়ে আনে তার চিত্র তিনি নিপুনভাবে এঁকেছেন 'পরতীপরিকথা' উপন্যাসে। 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের একটি হাসপাতাল খোলাকে কেন্দ্র করে। এই রুগ্ন গ্রামে নতুন সড়ক, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি গ্রামের জড়তা ভাঙল। গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের সংস্কারের অন্ধকার, জড়তা ভেঙে এক নতুন ভারতের স্বপ্ন রেণু দেখেছিলেন। এই স্বপ্ন, এই আন্দোলন, এই নতুন পরিবর্তন, চিত্রকে রেণু তাঁর কথা সাহিত্যে 'কলমবন্দী' করলেন - "দেশ কী আজাদী নে সমূচে ভারত কো আন্দোলিত কিয়া থা। আজাদী কে ঝুট-সচ কী পড়তাল করনে বালে লোগোঁ মে অলগ হী আজাদ ভারত কী ধড়কনে সুনাই পড় রহী থী। শহর আউর গাঁও কী দূরীয়া লাঁঘবার জন-জীবন মে উৎসাহ আ গয়া থা। অপনে দেশ কে লোগ কুছ সোচনে লগে থে, কুছ চাহনে লগে থে। পহলী বার শায়দ উন্হে অপনে চাহনে কী সার্থকতা কা এহসাস হোরহা থা। ওয়ে স্বতন্ত্র থে, ওয়ে কুছ সোচ সকতে থে, ওয়ে কুছ চাহনে কে লিএ ভী স্বতন্ত্র থে। ইহ সাধারণ ঘটনা ন থী। রেণু নে ইস ধড়কতে হুএ দেশ আউর জন কো কলমবন্দ কিয়া অপনে উপন্যাসো মে। অপনী কহানীয়ো মে অব ভী একদম কুছ নয়া ওয়ে ন লিখ পা রহে থে। 'ঠুমরী' কী কহানিয়ো মে আজাদ ভারত কী ধড়কনে সইসী নহী হ্যায়। যে কহানিয়াঁ ফির ভী পিছলে সময় আউর পিছলে লোগো সে থী জুড়ী হ্যায়। 'ঠৈস', 'লাল পান কী বেগম' ইয়া 'পক্ক লৈট' মে থোড়া-সা অন্তর' তো দেখা জা সকতা হ্যায়, মগর উহ উতনা স্পষ্ট আউর রেখাংকিত নহী হ্যায়।"[২৩]

যে পরিবর্তমান ভারতবর্ষের ছবি রেণু আঁকতে চেয়েছিলেন, তা গ্রাম নয় শহর নয়। গ্রাম ও শহরের সম্মিলনে সমুদ্ভূত এক ভারতবর্ষ।

স্বাধীনতার পূর্বে শুধু হিন্দী সাহিত্যে নয়, সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই অনেক কৃতী সাহিত্যিকারের কথা জানা যায়। যাঁরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। লেখনীকে করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র। আবার অনেকে এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে তা উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁদের রচনাকর্মে। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে অনেকেই এই ভাবনা থেকে সরে এলেন, সাহিত্যে ও জীবনে রাজনীতির সংশ্রব তাঁরা রাখলেন না। স্পষ্টভাবে না হলেও বোঝা গেল তাঁদের প্রার্থিত স্বাধীনতার চিত্র অন্যরকম ছিল, এই স্বাধীনতা তাঁদের হতাশ করছিল। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরে সতীনাথের রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহনের দৃষ্টান্ত তাঁর সততার এবং প্রতিবাদিতার একটি সর্বজন বিদিত প্রমাণ। কিন্তু রেণুজী বিয়াল্লিসের আন্দোলন থেকে সত্তর দশকের রাজনীতি পর্যন্ত তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। কালধর্মকে প্রকাশ করা, যুগের সাধারণ সত্য বলা থেকে কখনো বিরত হননি। সতীনাথ 'ঢোঁড়াই'কে ভারতীয় সাহিত্যের পাদ প্রদীপের সামনে এনে ছিলেন। ভারতবর্ষের দরিদ্র অবহেলিত বিশাল জনগণের একজনকে দেশের প্রগতি চেতনার বাহক করে তোলা ও তার মধ্যে 'ভারতীয়ত্ব' প্রতিফলিত করবার এই পরিকল্পনা রেণুকে প্রভাবিত করেছিল। রেণু স্বাধীনতা লাভের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, যা সতীনাথের 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিতে' কাংখিত ছিল। সতীনাথ ৪৭'র পর রাজনীতিতে থাকেননি কিন্তু রেণু রাজনীতির সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন।

স্বাধীনতার পর দেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশের বড় বড় পুঁজিপতি, সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূরা রাজনীতির পাদপ্রদীপে এলেন। দেশের জনসেবার পরিবর্তে, ক্ষমতার লোভ, মন্ত্রীর মসনদ দখলই ছিল এদের লক্ষ্য। গ্রামের জমিদাররা নিজেদের অধিকার প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য রাজনীতির জগতে এলেন। স্বাধীনতার আগে যে সেবাপরায়ন নিস্বার্থ রাজনৈতিক নেতা ছিল, তার পরিবর্তে এল কূটচক্রী, স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতারা। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর এরা হৃত ক্ষমতা উদ্ধারের জন্য রাজনীতিতে

এল। প্রথমে এরা জমিদার হয়ে গ্রামের সমস্ত বাতাবরণকে বিষময় করত, পরবর্তী কালে রাজনীতির সূত্র ধরে এরাই হলেন পঞ্চায়েত প্রধান, এম·এল·এ, এম·পি· প্রভৃতি। রেণুর উপন্যাসে এই গ্রামীন ভারতবর্ষের রাজনীতির এই পট পরিবর্তনের যথার্থরূপ চিত্রিত হয়েছে।

<u>পঞ্চায়েতরাজ ও ভারতীয় গ্রাম</u>

পঞ্চায়েত রাজস্থাপনা স্বাতন্ত্র্যোত্তর রাজনীতির এক বিশেষ অবদান। এই সুন্দর ব্যবস্থা গ্রাম্যরাজনীতির কবলে পড়ে কি অমানবীয় বীভৎস কৃতকর্মের প্রয়োজক হয়েছিল রেণুর উপন্যাসে তা যথার্থ ভাবে চিত্রিত হয়েছিল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতো পুরনো সতীনাথের উপন্যাসেও আমরা দেখেছি। কেমন টাকা খেয়ে 'চোটারদল' রাখিয়ার ও চোঁড়াইকে বিচ্ছিন্ন করল। রাখিয়া কে নিয়ে সামুয়েল ও পঞ্চদের খেলা উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পরে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংঘাতের পরিবর্তে সমূহ চেতনা এল। রেণু ও সতীনাথ দুজনের কথা সাহিত্যেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের নীচুতলার মানুষগুলির আচরণ ও মানসিকতা পরিবর্তনের ছবি আছে। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীবর্গ সমাজের স্বার্থসংঘাত রাজনৈতিক বাতাবরণ। আবার অন্যদিকে ঐ সমাজেরই ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা।

জাতি, মহল্লা, সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতি গ্রামবাসীদের মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল। ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাতেই পঞ্চায়েত বেশী সচেষ্ট, সেখানে সাধারণ গ্রামবাসীর সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় ঠাঁই পায়না। 'ময়লা আঁচল' থেকে পঞ্চায়েতের ক্ষমতাবান সদস্যদের ধূর্ততার উদ্ধৃত করা যাক। - "সারী পঞ্চায়েত মে দো হী ব্যক্তি এইসে হ্যায় জিনকে উপর মেল মিলাপ কী খুশী কা উল্টা অসর হুআ হ্যায়। ইসে কোই নহী সমঝ পাতে, লেকিন খেলাওন মে সব সমঝা লিয়া। খেলাওন কী চর্চা ভী নহী কী সিংঘনে। আউর ইস তহসীলদার কো তো দেখো, তুরন্ত গিরগিট কী তরহ বদল লিয়া, লড়াই ঝগড়া যাদব টোলী সে থা আউর গলে মিলে তহসীলদারজী। খেলাওন কো সঠবরসা নহী সমঝানা। সব চালাকী সমঝতে হ্যায়।"[২৪]

রেণুজীর 'জুলুস' উপন্যাসে গ্রামবাসীদের পারস্পারিক বিবাদ, মূল্যবোধের ভিন্নতা, আস্থা-অনাস্থা, নৈতিকতা-অনৈতিকতা সব প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামবাসীর যে জীবন তার পৃষ্ঠভূমি পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করেই নির্মিত। গ্রাম পঞ্চায়েতই গ্রামের বিভিন্ন সংঘর্ষ ও সংঘাতের স্রষ্টা। 'জুলুস' উপন্যাসে গ্রামের দুই ক্ষমতাবান রামচন্দ্র চৌধুরী ও তালেবর গোড়ীর যে সংঘাত দেখতে পাই, তার কেন্দ্রেও আছে পঞ্চায়েত। এদের এবং এদের দুজনের অনুগামীদের নানা মতবিরোধ এই উপন্যাসের অনেকাংশ জুড়ে। রামচন্দ্র চৌধুরী গ্রামের প্রধান ছিলেন। পরে পুত্রের পরিনামে তার সমস্ত সম্পত্তিও ও প্রধান গিরি চলে গেল। তালেবর গোড়ী এই অবস্থার সুযোগ নিল। যেহেতু সে গ্রামের সব থেকে ধনী ব্যক্তি, সেই ভাবে সে নিজেকে গ্রামের প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। উচ্চবর্ণের রামচন্দ্র চৌধুরী তাকে সর্বদা অপমান করবার চেষ্টা করল। জুলুসের পারুদা বর্ণনের কথা " অভী-অভী চৌধুরী আউর চৌধরী কা বেটা মুঝে রাস্তে মে মিলা। পুছা কি তুম্হারে গাঁও মে কোই শাদী হো রহী হ্যায় ? ম্যায়নে কহা নহী। শাদী নহী ভোজ হ্যায়। তালেবর বাবু নে গাঁও ভরকে লোগো কো ভোজ দিয়া হ্যায়। তো রামচন্দ্র চৌধুরী বোলা কি পহলে ভোজন দিয়া হ্যায়, বাদ মে শাদী ভী করে গা। "

<u>রুশবিপ্লব, সাম্যবাদ ও ভারতীয় গ্রাম</u>

১৯১৭তে রুশ বিপ্লব ও তার প্রভাব ভারতবাসীকে অনুপ্রানিত করেছিল এবং ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী 'অর্থনৈতিক মন্দা'র প্রভাবে ভারতের মতো সাম্রাজ্যবাদী শাসিত দেশে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনধারায় বড়ো আঘাত হিসেবে দেখা দেয়। এসময় দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ভূমিকাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৯২০ তে ভারতের বাইরে কম্যুনিষ্ট সংগঠন তৈরী, ১৯২৭-২৮ এ ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও সাম্যবাদী চেতনার প্রসার, সন্ত্রাসবাদী সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ও তাদের সক্রিয় ভূমিকা সমস্ত পরিবেশকে এবং জীবনধারাকে করে তুলেছিল রাজনীতি সচেতন। রাজনীতি, সাধারণ অতি সাধারণ মানুষকে, তার সমাজকে

ও আজন্ম লালিত সংস্কারকে কিভাবে পাল্টাচ্ছিল তা সতীনাথ ভাদুড়ী ঢোঁড়াইচরিত মানসে আমাদের দেখিয়েছেন। রেণু গান্ধীজী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অল্প বয়সে, এই আন্দোলন কে কেন্দ্র করেই রেণু ক্রমে ক্রমে উপন্যাসোপযোগী পটভূমি ও পরিবেশের সন্ধান পেয়েছিলেন, জমির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত থাকার ভারতীয় গ্রামকে চিনেছিলেন অনেক গভীরে। সতীনাথের মত তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন নতুন ও পুরনো মূল্যবোধের নিরন্তর সংঘর্ষের কাহিনী লেখার উপজীব্য হওয়া উচিৎ। সতীনাথ "ঢোঁড়াই' প্রবন্ধে লিখেছিলেন - " মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে"। তাঁর এই মন্তব্যের পিছনে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের দিক সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় আছে। আমরা জানি, তিনি জেলে থাকাকালীন সময়ে সোসালিস্ট ও মার্কসীয় দর্শন পড়েছিলেন, উত্তর বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে যখন তিনি রাজনীতি করতেন তখন মার্কসীয় দর্শনের প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। রেণুও তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সক্রিয় ভূমিকা, বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক তত্ত্বদর্শনের প্রতি উদার জ্ঞানপিপাসু পাঠকমন নিয়ে ধরতে পেরেছিলেন রাজনীতির প্রকৃত দ্বান্দ্বিক সত্যকে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভারতবর্ষের প্রকৃত রাজনৈতিক চেহারা - তার ত্রুটি বিচ্যুতি, আদর্শবাদ ও দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উপদলগুলির কার্যকলাপ, মতামত, অসঙ্গতি কে বাস্তব রূপ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সামাজিক জীবনে ও ব্যক্তি মানসে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপকে উদ্ঘাটন করেছেন শিল্পী ফণীশ্বর নাথ রেণু। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাগ হওয়া নিয়ে তাঁর 'আত্মসাক্ষী'র মত ছোট গল্প ভারতীয় সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে বামপন্থী শক্তির অনুপ্রবেশ একটি বড় ঘটনা। ১৯৩৯ এ অখিল ভারতীয় কিষান সভা এর একটা বড় প্রেরণাদায়ী ঘটনা। ৪৬ এ সোসালিস্ট পার্টির পত্তন গ্রামীন রাজনীতিতে পরিবর্তনের ঝড় আনে। 'ময়লা আঁচলে' এই পরিবর্তনের অসংখ্য চিত্র আছে। কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে রেণুজী তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন। ময়লা আঁচলে,

কালীচরণ ও বাসুদেবের সংলাপে, সোসালিস্ট পার্টির উত্থানে গ্রামের সাধারণ মানুষের মনে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা একটু উদ্ধৃত করা যাক - "সুসলিং পার্টী। এহী পার্টি আসল পার্টী হ্যায়। গরম পার্টি। কিরান্তীদল কা নাম শুনা থা ? .... ওহী পার্টী। ইসমে কোই লীডর নহী। সভী, সভী লীডর হ্যায়। সুনা নহী। হিংসা বাত তো বুরুজুআ লোগ বোলতা হ্যায়। বালদেব জী তো বুরুজুআ হ্যায়, পুঁজিবাদী হ্যায়। ..... ইস কিতাব মে সব কুছ লিখা হ্যায়। বুরুজুআ, পেটী বুরুজুআ, পুঁজীবাদ, পুঁজীপতি, জালিম জমীদার, কমানে বালা খাএগা, ইসকে চলতে জো কুছ হো।" [২৫]

ভারতীয় গ্রামজীবনে বামপন্থী শক্তির প্রবেশে অবহেলিত সম্প্রদায়ের জাগরণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণচেতনার প্রসার 'ময়লা আঁচল' ও 'পড়তি পরিকথা'র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সতীনাথ ও রেণু দুজনেই তাঁদের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, গ্রাম জীবনে বিদেশী বণিক স্বার্থের প্রধান রক্ষক হল ভূস্বামীশ্রেণী। সুতরাং ইংরেজ - সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হলে ভূস্বামী শ্রেণীকে আঘাত করতে হবে। তাই অসহযোগ আন্দোলনে যখনই কৃষক-সমাজ অংশগ্রহণ করেছেন, তখনই তা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বামপন্থী শক্তি ও মতবাদের সহায়তা কৃষকদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়াসে, তাঁদের আন্দোলনে - সংগ্রামে শিক্ষিত সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে আরো সক্রিয় হল। রেণুর উপন্যাসে ভারতীয় গ্রামে বামপন্থী শক্তির প্রবেশের চিত্র দক্ষতার সঙ্গে অংকিত হয়েছে।

সাম্যবাদ গ্রামের কৃষকদের মধ্যে এক নতুন জাগরন এনেছিল। 'ময়লা আঁচলে' মেরীগঞ্জ গ্রামে সৈনিকজীর ভাষনে কৃষকদের নিজের অধিকারের প্রতি সজাগতা, পুঁজিপতি, সামন্তশ্রেণীর প্রতি আক্রোশ ব্যক্ত হয়েছে - " জিস তরহ সুরজ কা ডুবনা এক মহান সচ

হ্যায়। পূঁজীবাদ কা নাশ হোনা উতনা হী সচ হ্যায়। মিলো কী চিমনিয়া আদা উগলেগী আউর উন পর মজদুরো কা কব্জা হোগা। জমীনো পর কিসানো কা কব্জা হোগা। চারো আউর লালধুয়া ঝন্ডরা রহা হ্যায়। উঠ্‌ঠো কিসানো কে সচ্চে সপুতো। ধরতী কে সচ্চে প্রহরীয়ো উঠঠো। প্রগতি কা মশাল লেকড় আগে বড়ো। বোলিয়ে একাবার প্রেম সে - সোশালিস্ট পার্টী কী জৈয়।"[২৬] জমিদার-পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, কিসান-মজদুরদের সংগঠন, গ্রামীন জীবনে এক নতুন পরিবেশের সংকার করে।

সোসালিস্ট পার্টির সভা, নেতাদের ভাষণ মেরীগঞ্জের সাঁওতাল টোলাকে খুব আলোড়িত করেছিল। এদের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সামন্তবর্গ মুনাফা লুটেছে অনেককাল। - 'জমীন জোতনে বালে কী' এই আওয়াজ আদিবাসী কৃষকদের কাছে যেন তাদের অস্তিত্বের ঘোষনা। স্বাধীনতা পূর্ব থেকেই জমিদখলের জন্য, ফসলের ন্যায্য ভাগের জন্য আদিবাসী কৃষকদের আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা আনে। স্বাধীনতার আগে এই আন্দোলন তেমন সুসংগঠিত ছিল না। তাই ঢোঁড়াই-এর আগ্রহে বিসকান্ধা গ্রামে বড়কা মাঝির আন্দোলন যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি মেরীগঞ্জ গ্রামে বীরজা মাঝির আন্দোলনও ব্যর্থ হয়। সোসালিস্ট পার্টির সংস্পর্শে হয়ত ঢোঁড়াইদের তুলনায় বীরজা মাঝির আন্দোলন বেশী আক্রমনাত্মক। কিন্তু মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব যাঁরা সামন্তবর্গের স্বার্থরক্ষক এদের তারা মাঝপথে ত্যাগ করে, আন্দোলন থেকে পিছু হটে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে এই ছবির অনেক পরিবর্তন হয়। অঞ্চলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জীবন যাপনে পরিবর্তন আনে। কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়। ছোট-ছোট কৃষকরা জোট বাঁধে বড় কৃষকদের বিরুদ্ধে। ভূমিসংস্কার আইন বুঝতে চায়। নিজের জমির দখলীসত্ত্ব - কানুনী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কৃষকদের এই নতুন চেতনার ছবি রেণু এঁকেছেন 'পড়তি পরিকথা' উপন্যাসে।

ভারতীয় কৃষক ও পরিবর্তিত অবস্থা

সময়ের সাথে সাথে সাধারণ ভারতীয় কৃষকরা তাদের দীর্ঘদিন লালিত সংস্কার পাল্টেছে এবং ক্রমে হয়ে উঠেছে রাজনীতি সচেতন। এই পরিবর্তমান মানসিকতার চিত্র দুই লেখকের রচনাতেই ধরা পড়েছে। তবে রেণুর এই পরিবর্তমান চরিত্রগুলির অনেকগুলি টাইপ বা তার নিজস্ব মতবাদের বাহক হয়েছে। গ্রামের কৃষকদের উন্নতির জন্য শহরের শিক্ষিত মানুষদের কাছে আবেদন করা, জমিদারের ভূমিহীনের মধ্যে জমি বিলি করা, কখনো সাম্প্রদায়িক জীবনের টানের সাথে (জীতেন্দ্র : পড়তি পরিকথা) শোষনমুক্ত সমাজবাদ, এ সবের মধ্যে কখনো যেন শরৎচন্দ্র, তারাশংকর প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু সতীনাথের চরিত্রগুলি কখনোই কোনো টাইপের আশ্রয় নেয় না।

সতীনাথ দেখিয়েছিলেন স্বাধীনতার সূচনা থেকেই কিভাবে 'জাগরী'র ধনী কিষানরা 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'এর রাজা সাহেবরা নতুন শোষকের রূপ নিচ্ছে। সতীনাথ 'উত্তর ঢোঁড়াইচরিত' লিখলে এদের ছবি অবশ্যই থাকত। সতীনাথ তা লেখেননি। সতীনাথের পরিকল্পিত 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিতের বিষয় (যা অবশ্য সমসাময়িক উপাদান) এনেছেন রেণু তাঁর সাহিত্যে। সতীনাথ অংকিত ঐ নতুন শোষকরা স্বাধীনতার পরে ক্ষমতা বাড়ানোর লোভে কিভাবে নিজেদের তুলে ধরল রেণু তা এঁকেছেন যথাযথ ভাবে। এই শ্রেণীরই একটি প্রতিনিধি মূলক চরিত্র 'পড়তি পরিকথা'র শ্যামগড়ের রাজা কামরূপ নারায়ন। স্বাধীনতার পর কৃষকদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও জমিদারী প্রথা উন্মীলন এই শ্রেণীর সামনে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন পরিবেশ তৈরী হয়। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। ঐ সামন্তবর্গরা রাজনীতিকে করে তাদের শোষনের নতুন হাতিয়ার। মন্ত্রীত্ব, গদি, ক্ষমতা পাবার জন্য এরা নিজস্ব সংগঠন তৈরী করে। 'পরতী পরিকথাতে' শ্যামগড়ের রাজা কামরূপ নারায়ন জমিদারী প্রথা উন্মীলনের সাথে সাথে নিজের অস্তিত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখবার স্বার্থে, নিজের আধিপত্যের জন্য, সুরক্ষার জন্য 'প্রজাপার্টি' গঠন করে এই ধরনের প্রজাপার্টি যে কি ধরনের পরিহাস, তা কামরূপ নারায়নের বক্তব্যর মধ্যেই

ধরা পরে। জিতেন্দ্রর কাছে এই ধরনের সংগঠনের তাৎপর্য সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন, তাতেই সবকিছু ধরা পরে -

" অপনে স্টেট কে তীন সার্কিল ম্যানেজর পচাস পটায়ারী আউর ডের সো পেয়াদা কো লেকর ম্যায়নে 'প্রজাপার্টি' কা শিলান্যাস কিয়া হ্যায়। কহা, চলো, তুম্হারী নৌকরিয়াঁ অপনী জগহ পর বরাবর। জমিদারী চলী গই, রাজা চলা গয়া, ফির ভী বেতন দুঙ্গা। আহোদা বদল গয়া হ্যায়, কাম বদল গয়া হ্যায়। অউর আজ দেখো। কই বামপন্থী সঠে-সঠায়ে লোগ আ গএ হ্যায়। বকীল, মুখ্তার, প্রোফেসর, ছাত্র, মহিলাএঁ। ম্যায়নে প্রান্তভর মে বিখরী শক্তি কা সঞ্চয় কিয়া হ্যায় - জো সহী নেতৃত্ব কে অভাব মে বুঝী জা রহী থী। পিছলে দিনো দো দো বামপন্থী পার্টিয়ো নে প্রজা পার্টীকে ঝণ্ডে কে সাথ অপনা ঝণ্ডা বাঁধকর বিধান সভা কে সামনে প্রদর্শন কিয়া হ্যায় - 'রেন্ট ফ্রী ল্যান্ড আউর বগৌর কিসী খজানা কে জমীন। দে'সকী হ্যায় আজ তক কোই পার্টী এ্যাইসা ক্রান্তিকারী নারা ?" [২৭]

<u>রাজনীতি ও সামাজিক সংকট</u>

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ভারতীয় রাজনীতি অদ্ভুত রূপ নেয়। 'জাগরী'তে বাবার স্মৃতিমন্থন অংশে ধরা পড়ে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মতবিভেদ ও ত্রুটি বিচ্যুতি কি পরিমানে - "কেয়া সদাশিউ, ভূমিহার-রাজপুত-জাতীয় মহাসভা কী বৈঠক খতম হুই' - লক্ষ্য সূত্র যজ্ঞের উপর। বিহারের গরমপন্থীরা অর্থাৎ সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ডব্লক ও কিষাণসভার সদস্যরা দক্ষিনপন্থীদিগকে এই বলিয়া ঠাট্টা করে যে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কেবল স্থানীয় ভূমিহার ও রাজপুত জাতের পারস্পরিক দলের মুখপাত্র মাত্র। প্রাদেশিক কংগ্রেসে নাকি রাজনৈতিক দলাদলি নাই, দলাদলি আছে জাত নিয়ে আর ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া। কথাটা কতকাংশে সত্য। আমাদের দেশে স্বরাজ কি কখনও হইবে, এক এক সময় ঘৃণা ধরিয়া যায়। নীলুর বিলুর দলগুলি যাহা বলে তার সব ভুল নয়"। [২৮]

স্বাতন্ত্র্যোত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে এই বিভেদ আরো সংকটের সৃষ্টি করেছে। এই রাজনীতি থেকে সতীনাথ দূরে সরে গিয়েছিলেন, তাঁর রচনাকর্মে এসব আর আনেনি। কিন্তু রেণু দেখিয়েছেন এর ভয়াবহতা। এসব চিত্র যেন সতীনাথের অংকিত চরিত্রগুলিরই পরম্পরা। ক্রমে এই সবই রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল, দেশের অপেক্ষা দলের অধিক মহত্ত্ব দান। দেশে অনেক ছোট বড় দলের উৎপত্তি হয়েছে। সমাজবাদের আওয়াজ তোলা সত্ত্বেও এসব দলের কেন্দ্রভূমি হয়ে রইল জাতিবাদ, সম্প্রদায়বাদ, ক্ষেত্রবাদ এসবই জনতার সামাজিক অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ। এসব দলের নেতারা জনতার কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে জনতাকেই বোকা বানায়। এদেরকে সতীনাথ স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তেই দেখেছিলেন । তার ঢোঁড়াই যা দেখেছে তা পরবর্তী কালে 'ময়লা আঁচলে'র কালীচরণ বাসুদেবরা তা দেখে আরো ব্যাপক ভাবে। এই দুই লেখক একই অভিজ্ঞতার দুরকম ছবি এঁকেছেন - "ভিনদেশের রঙ বেরঙের পাখি লাল মুখো কাকতাড়ুয়া দেখে দিশাহারা হয়ে পালাচ্ছিল, সাঁঝ পড়াতে এক গাছে রাত কাটাচ্ছে। তারই নাম আজাদ দস্তা। বুলি মুখস্ত তোতা আছে, নাচনদার ফিঙে আছে, পাঁকে পাখি কাদা খোঁচা আছে। সবজান্তা ভুশণ্ডী কাক আছে।' এদের কাজটা কি ? চাঁদা তোলা, অসাধুতাকে প্রশয়, সক্রিয় আন্দোলনের নামে সাধারণ লোককে, ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, দোষ ত্রুটি চাপতে ইউনিয়ন বোর্ডের ফাইল, জ্বালানো, টাকার অংশ ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার তারপর একদিন দলছুট হয়ে বেরিয়ে গিয়ে আদল পালটে ফেলা - এসবই ঢোঁড়াই দেখেছে। সবত্রই স্বার্থান্ধতার তীব্র প্রতিযোগিতা।"

এই সংক্রমন থেকে অজগ্রামবাসীরাও রেহাই পায়না। (ময়লা আঁচল) বিভিন্ন দলকে চাঁদা দিতে দিতে বিরক্ত লছমী কোঠারিনের বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। বালদেব যখন লছমী কোঠারিনের কাছে চাঁদা চাইতে যায়। তখন লছমী ব্যঙ্গ শ্লেষ মিশিয়ে বলে - "গাঁও মে তো রোজ সেন্টর খুল রহা হ্যায় - মলেরিয়া সেন্টর, কালীটোপী সেন্টর, লাল ঝন্ডার সেন্টর, আউর চরখা সেন্টর" যুগ যুগ থেকে শোষিত-পীড়িত লোকেরা বিভিন্ন দলের স্লোগানে আকৃষ্ট হয়ে ভাবে, এই দল এলেই তাদের দুঃখের অবসান হবে। কালীচরণ,

বাসুদেব কিসান-মজদুর রাজ স্থাপনের জন্য সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। এই পার্টির সভার উত্তেজক ভাষণ তাদের শিহরণ জাগায়। 'ইহ জো লাল ঝাণ্ডা হ্যায়, আপকা ঝাণ্ডা হ্যায়। ইসকী লালী উগতে হুএ আফতাব কী লালী হ্যায়, ইহ খুদ আফতাব হ্যায়, ইনক্লাব কা ঝণ্ডা হ্যায় ..... জমীনো পর কিসানো কা কব্জা হোগা। চারো তরফ লাল ধুজা ভণ্ডরা রহা হ্যায়। উঠ্‌ঠো কিসানো, কিসানো কে সচ্চে সপুতো। ধরতী কে সচ্চে মালিকো উঠ্‌ঠো। ক্রান্তি কী মশাল লেকর আগে বঢ়ো।"২১ গ্রামের নিম্নবর্গের লোক যেমন সমাজবাদী চিন্তার পতাকাতলে এক হবার স্বপ্ন দেখছে। তেমনি হরগৌরী সিংহ এর মত উচ্চ বর্গের লোকেরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের আশ্রয় নিচ্ছে।

ভারতীয় গ্রামগুলিতে অসংখ্যবর্ণ, শ্রেণী, জাতি বিভেদ বহুকাল ধরে পাষানের মত জগদ্দল হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর এই বিভেদনীতিকে আশ্রয় করল রাজনীতি। গ্রামগুলিতে সম্প্রদায়গত ভাবে আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য এক - একটি রাজনৈতিক দল পুষ্ট হতে লাগল। 'ময়লা আঁচলে' মেরীগঞ্জ গ্রাম যেন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যাদব-টোলী, ব্রাহ্মণটোলী, কায়স্থটোলী, রাজপুত টোলী বর্ণাশ্রম ভিত্তিক ভারতীয় সমাজেরই ভগ্নাংশ। এই সব টোলির মানুষেরা ভিন্ন-ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। নিম্নবর্গের লোকেরা যে দলকে সমর্থন করে, উচ্চবর্ণের লোকেরা তা করে না। গ্রামে হাসপাতাল খুলবার আনন্দে মঠের মোহান্ত সাহেব ভণ্ডরা দেয়। কিন্তু সমস্ত গ্রামবাসী একসাথে পঙক্তি ভোজন করেনা। ব্রাহ্মণরা তাদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করতে বলে। সিপাহীটোলার রাজপুতরা যাদবটোলার সাথে এসে ভোজন করবে না বলে সরাসরি জানিয়ে দেয়। এরকম জাতিগত বিভেদের চিত্র রেণুজী অনেক এঁকেছেন। ডাঃ প্রশান্ত শহর থেকে মেরীগঞ্জ গ্রামে এলে তাকে প্রথম যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তা হল তিনি কি জাত ?

মেরীগঞ্জের উৎসাহী নেতা কালীচরণ মিছিল নিয়ে পূর্ণিয়া শহরে এলে, তাকে কংগ্রেসের মিছিল থেকে সোসালিস্ট পার্টির লোকরা আড়ালে নিয়ে তার জাত ও গ্রামের সংবাদ নেয়। মেরীগঞ্জ গ্রামে যাদবের আধিক্য জেনে একজন যাদব সম্প্রদায়ের নেতা গঙ্গা প্রসাদ সিং যাদবকে তাদের গ্রামে পাঠায় দলের সংগঠনের জন্য। কালীচরণ নিজে যাদব, সোসালিস্ট

পার্টি থেকে একজন যাদবকর্মী পাঠিয়েছে, অতএব তাকে সাহায্য করা যেন তার জাতিগত কর্তব্য। জাতের কথা ভেবেই সে কংগ্রেস দল থেকে সেই মুহূর্তে সরে আসে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির জাত-পাত নিয়ে রাজনীতি করবার অসংখ্য ছবি রেণু এঁকেছেন। "জিলা কংগ্রেসকে সভাপতি কে চুনাও রাজপুত আউর ভূমিহার মে মুকাবলা হ্যায়। ..... কাটিহার কাটন মিল বালে শেঠজী ভূমিহার পার্টিমে হ্যায় আউর ফারবিশ গণ্ডভূট মিল বালে রাজপুতো কী ওর। ..... পৈসে কা, তমাশা কোই ইহা আকর দেখো।"[৩০]

এসব দেখে আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মী বাঘন দাস প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে - "সব চৌপট হো গয়া ..... ইহ পটনিয়া রোগ হ্যায়। অব তো আউর ধূমধাম সে ফলেগা। ..... ভূমিহার, রাজপুত, কৈথ, হরিজন সব লড় রহে হ্যায় .... জলে চুনাও মে তিগুনা চুনে আএ গে"। জাতপাতের সাথে ভারতীয় গণতন্ত্র, ভোটের রাজনীতি কিভাবে জড়িয়ে পড়ছে, রেণু তার সজীব চিত্র এঁকেছেন। এদিকটিকে স্মরণ করে Yogendra K. Malik - এর 'Contemporary Political novels in Hindi : an interpretation থেকে কিছু উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে - "Phaneshivarnath Renu's remarkable work Maila Anchal is another story of a politicized rural community. In this work he focusses on how traditional caste revalries have been transformed into struggle for political power. The struggle has many dimensions; at times, it takes the form of a struggle for supremacy among the high castes, yet the high castes immediately close ranks and conspire in opposition to the low castes, whenever the latter pose a challenge to their power in the society. Politics in this backward village of Bihar, the selling of Renu's story, is

dominated by a struggle between three factions, all organized around numerically and socially dominant castes - the Rajputs, the Kayastha and the Yadavs. The members of the Brahmin castes leading groups traditionally, now play a balancing role, since all the other castes in the village are aligned with one faction or an other. All in all, he furnishes a fascinating description of how after independence, the land-owning middle castes captured the Congress party and through it have frustrated all efforts at land reforms. In short(Shukla) and Renu are the only Hindi Novelists who have been successful in giving life to what Morris-Jones calls the "traditional idioms" of the Indian political culture."[৩১]

দূরভিসন্ধিমূলক শহুরে রাজনীতি গ্রামের মানুষের সহজ স্বাভাবিক মেলামেশাকে নষ্ট করে দিয়েছে। কোথায় গেল ভারতীয় গ্রামের শাশ্বত রূপ। স্বাধীনতার পর এই পরিবর্তিত গ্রামজীবনের ব্যাথা-বেদনা উপলব্ধি করে 'পরতী পরিকথা'তে জিতেন্দ্র বলে (যা একান্তভাবে রেণুজীর উপলব্ধি) - "গাঁও সমাজ মে, মনুষ্য কে সাথ মনুষ্য কা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থা। কিন্তু অব নহী রহা। এক আদমী কে লিএ উসকে গাঁও কা দুসরা আদমী অজ্ঞাতকুলশীল ছোড়কর আউর কুছ নহী। কহাঁ হ্যায় আজ কা কোই উপযোগী দখল অনুষ্ঠান, জহাঁ আদমী এক-দুসরে সে যুক্ত হোকর মিল সকে ? মনুষ্য কে সাথ মনুষ্য কে প্রাণ কা যোগ-সূত্র নহী ....।"[৩২]

স্বাধীনতা পরবর্তী কালীন অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা

'ময়লা আঁচল' ও 'পরতী পরিকথা' এই দুটি উপন্যাসের পর রেণুজী ভিন্ন জগতে প্রবেশ করলেন। ভারতীয় গ্রামগুলিতে অবহেলিত সম্প্রদায়ের জাগরন, সেই সঙ্গে দেশের

রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গণ চেতনার প্রসার, ভূমি সমস্যা, ভূমির অধিকার ইত্যাদি ছিল এই দুটি উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী উপন্যাসগুলি - 'দীর্ঘতপা' 'জুলুস', 'কিতনে চৌরাহে' ও 'পন্টুবাবু রোড' তে নতুন নতুন সমস্যার প্রকাশ হল। এর মধ্যে 'কিতনে চৌরাহে' উপন্যাসটি দেরীতে লেখা হলেও বিষয়ের ও সময়ের দিক থেকে 'ময়লা আঁচল' ও 'পরতি পরিকথা'র অগ্রবর্তী। এই উপন্যাসের পরিবেশের সাথে ও সময়ের সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসের খানিকটা সাযুজ্য আছে।

স্বাধীনতার পর দেশের যুগ-পরিবেশের সঙ্গে রেণুর ভাবনা কতখানি যুক্ত হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের সমস্যা, গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব, শহরের মধ্যবিত্ত মানুষদের জটিলতা, পরিবর্তিত নারীসমাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কার গণচেতনার সাথে সমসাময়িক গণমানসের তুলনা, অধঃপতিত রাজনীতি, সামাজিক ন্যায়নীতিবোধ, অনাচার সময়ের সাথে-সাথে মানুষের পরিবর্তিত মূল্যবোধ, ইত্যাদি অজস্র বিষয়, যা ময়লা আঁচল বা পরতী পরিকথার বিশেষ সমস্যার মত তীব্র নয়, 'দীর্ঘতপা', 'জুলুস', 'পন্টুবাবু রোডের' সমস্যাগুলির স্বাধীনতাপরবর্তী কালের, সতীনাথ এই সমস্যার দু চারটি বিষয় তার ছোট গল্পে এনেছেন উপন্যাসের বড় ক্যানভাসে আঁকেননি। তাঁর 'উত্তর চৌত্রাই চরিত' যদি লেখা হত, হয়ত তাতে এসব সমস্যার তাপ নিশ্চই পাওয়া যেত।

'দীর্ঘতপা' : নারীসমস্যা

স্বাধীনতার পর সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নারী-প্রগতি, নারীর জাগরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই পর্বের নারী জাগরণ শুধু সাংস্কৃতিক নয়, এখানে নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আছে। এই সংগ্রাম শুধু মাত্র উচ্চশ্রেণীর রমনী নয়, খুব ব্যাপকভাবে না হলেও তা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের নারীকেও স্পর্শ করেছে। এই জাগরণে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত প্রেরণার সাথে অর্থনৈতিক তাগিদও ছিল। এর ফলে নারী-ব্যক্তিত্বে যে নতুন প্রকাশ দেখা গেল, নারীজীবনে নতুনতর সমস্যা দেখা দিল এবং এর

ফলে সাহিত্যে উপস্থাপিত নারী চরিত্রেও স্বাতন্ত্র্য দেখা দিল। রেণুজীর তৃতীয় উপন্যাস 'দীর্ঘতপা'। এই উপন্যাসটিতে স্বাধীনতা পরবর্তী পরিবর্তিত নারী সমাজের চিত্র অংকিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর দেশ শাসনের বিশৃংখলা, আমলাতন্ত্রের কাজ-কারবার, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়গুলি সতীনাথের কয়েকটি ছোট গল্পেস্থান পেয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারতীয় নারী সমাজে যে বিশেষ পরিবর্তন এলো, তা নিয়ে বিশেষ কোন নারীচরিত্র সৃষ্টি করেননি। নতুন চেতনা ও ভাবসংঘাতে যে জটিলতা সৃষ্টি হল, তেমন সমস্যা মূলক জটিল নারীচরিত্র তিনি আঁকেননি। সতীনাথ ভাদুড়ী উত্তর বিহারের যেসব গ্রাম্য দেহাতী নারীচরিত্র এঁকেছেন তার সাথে ফণীশ্বর নাথ রেণুর গ্রাম্য নারীর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আধুনিক পরিশীলিত প্রগতিবাদী চেতনা সম্পন্ন কোন নারীচরিত্র অংকন করেন নি। তার নারীরা চিরকালীন ভারতীয় নারীর আদর্শে তৈরী, তাঁরা আদর্শ, স্ত্রী, ভগিনী, মমতাময়ী নারী। জাগরীর মা রাজনৈতিক তত্ত্ব না বুঝেও শুধ মাত্র পতি ভক্তির জন্য মহাত্মাজীর পথকে গ্রহণ করেছেন। আশুয়েরওগৃহস্থালি চালিয়েছেন আবার জেলেও এসেছেন ছেলের জন্য দুঃখে জর্জরিত হয়ে স্বামীর অভিযোগ করেন বিরুদ্ধে - "তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছ সত্যি, কিন্তু আমাকেও একটুও স্বাধীনতা দাওনি, তোমার কথার উপর কোনদিন টু শব্দ করিনি। আমার সংসার ছারখার হয়ে গেল'। গান্ধীজীকেও ভর্ৎসনা করেছেন - 'মহাত্মাজী না ছাই'। দোষে গুনে এক সাধারণ নারী স্নেহময়ী জননী ও স্বামীর আদর্শ ভগিনী। বাণী রায় সতীনাথের নারী-চরিত্রগুলি সম্পর্কে লিখেছেন - "তাঁর পুস্তকের নায়িকারা উচ্চশিক্ষিতা, ইনটেলেকচুয়াল মন কেউ, অতি সাধারণ। নীলুর পিয়া দেহাতী মূর্খ মেয়ে সরস্বতী, 'জাগরী'তে। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনীর' নায়িকা অ্যান হোটেলের ঝি।"[৩৩]

অনেক ইনটেলেকচুয়াল পুরুষের মতই তিনি নিছক নারীত্বমন্ডিত, স্নেহপ্রীতিময়ী সাধারণ নারীকে সাহিত্যে মনোয়ন করেছেন।

'দীর্ঘতপা' রেণুজীর তৃতীয় উপন্যাস। নারী প্রধান এই উপন্যাসটিতে বিভিন্ন ধরনের নারীচরিত্র রয়েছে, এদের সমস্যাও বিভিন্ন ধরনের। উপন্যাসটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের। উপন্যাসের ঘটনার কেন্দ্রস্থল বাঁকীপুর অঞ্চলের উত্তমেন ওয়েল ফেয়ার বোর্ডের একটি ওর্য়াকিং উত্তমেনস হোস্টেল। সমাজসেবার সাথে যুক্ত কর্মীরা ও শিক্ষানবীস মহিলারা এই হোস্টেলে থাকতেন। ধাত্রীবিদ্যা, বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প, প্রাথমিক শিক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবা-মূলক কাজ ও তার ট্রেনিং দান এই সংস্থার অর্ন্তভুক্ত ছিল। এই সবের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের মহিলার কার্যকলাপ, ঘাত-প্রতিঘাত উপন্যাসে সঞ্জীবিত হয়েছে। এই উপন্যাসের প্রধাণ চরিত্র বেলা। যিনি ঐ হোস্টেলের কেয়ারটেকার। স্বাধীনতা-পূর্ব কালের কিছু ছবি বেলার অতীত জীবন থেকে দেখানো হয়েছে। নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বেলাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গুপ্ত সমিতিতে যোগদান, বেনারসের রূপোজিবিনীদের গলির অন্ধকার জীবন, অনেক অশুভ শক্তির সাথে লড়াই করেও সে কখনো ভেঙে পড়ে নি। বেলার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেশ স্বাধীনতা পেলে, পরাধীনতা মুক্ত হলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর এল মোহভঙ্গ। সরকারী আমলাদের ভ্রষ্টাচার, ছদ্মবেশী সমাজ সেবী, স্বার্থপর মানুষদের কুচরিত্র দেখে নতুন দেশ গড়বার আশা তার পদে পদে ব্যাহত। তবুও মিসেস আনন্দ এর মত তথাকথিত ভন্ড সমাজসেবীর সাথে লড়াই করেও সে সেবার ব্রত ত্যাগ করে না। সেবা তার কাছে তপস্যার মত এই তপস্যাই তার জীবন তপস্যা।

এই উপন্যাসে রেণুজী সমাজে নারীর স্থান নিয়ে অনেক বক্তব্য রেখেছেন। একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল - 'নারী পুরুষ কা চমড়ে কা পোর্ট ফোলিয়ো ব্যাগ হ্যায়। চমড়ে কা থৈলা তর্ক নহী করতা, তো বেলা কয়া তর্ক করতী হ্যায় ।"[৩৪]

বেলার সহচরী মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়ে ফতেমা পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বলেছে - 'বোর্খা - পর্দা - মুর্দাবাদ'।

হোস্টেলে বিভিন্ন প্রদেশ-বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে সংহতি আনবার জন্য সবাই যে ভারতীয় এই চেতনা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মহিলারা কতটা এগোচ্ছেন এবং আগামী দিনে কতটা এগোতে পারেন-রেণু তার উপন্যাস রচনার বৈশিষ্ট অনুযায়ী তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা অনেক নারী চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় নারীর জীবনে যে আলোড়ন ও পরিবর্তন এসেছে, এ উপন্যাসে তারই সজীব চিত্র আঁকা হয়েছে।

'জুলুস' : উদ্বাস্তু সমস্যা

আগষ্ট, ১৫, ১৯৪৭। রাজনৈতিক প্রয়োজনে, Redcliff Award - এর পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও ইসলাম ধর্মাশ্রিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে দ্বিধা বিভক্ত হলো অখন্ড ভারতের দুটি অর্ধ-রাজ্য। পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব এবং পূর্বভারতের বঙ্গদেশ। দেশ বিভাগ নিয়ে শরনার্থীদের দুর্ভাগ্যের কথা ভারতীয় সাহিত্যে অনেক লেখা হয়েছে। রেণু তাঁর 'জুলুস' উপন্যাসে এই সমস্যার সাথে কয়েকটি প্রশ্নের সংযোগ ঘটিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে এক ভিন্ন যাত্রা আনেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষে এই শরনার্থীদের পুর্নবাসন দেওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। সরকারী ভাতায় এদের পরিচর্যা করা হত। পাঞ্জাবের শরনার্থীদের তুলনায় বাঙালী শরনার্থীদের সমস্যা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। পাঞ্জাবী শরনার্থীদের বিভক্ত পাঞ্জাবেই হয়েছে পুর্নবাসন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরনার্থীদের পুর্ণবাসন শুধু পশ্চিম বঙ্গেই হয়নি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে হয়েছে। ভাষা-সংস্কৃতি-খাদ্য-আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মেলামেশায় তাদের অসুবিধা। স্বাধীন ভারতবর্ষে নিজের দেশে এসেও অনেক শরনার্থী তাদের পরবাসী ভাবতেন। ছেড়ে আসা জন্মভূমি ও স্বাধীন ভারতবর্ষ কোনটি তার নিজের দেশ ? এই প্রশ্ন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হতো। রেণু তাঁর এই উপন্যাসে অনেক শরণার্থীর মুখ দিয়ে এ প্রশ্ন তুলেছেন ? সতীনাথের

সাহিত্যেও বাঙালী উদ্বাস্তু, শরণার্থীরা এসেছেন। তাদের সমস্যা ও জীবনযাপন নিয়ে সতীনাথ একমাত্র 'গণনায়ক' গল্পটি ছাড়া বড় ক্যানভাসে লেখেননি কিছু। 'পরিচিতা' 'ব্লাড প্রেসার' ইত্যাদি গল্পে, শরণার্থীচরিত্র আছে, কিন্তু এরা কেউই রেণুর 'জুলুস' উপন্যাসের চরিত্রগুলির মত কোন মৌলিক সমস্যার প্রসঙ্গ অবতারণা করে না। রেণু স্বাধীনতার পর উদ্ভূত এই সমস্যার অবতারনা তার উপন্যাসে করে, ভারতীয় উপন্যাসকে এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিলেন।

"'জুলুস' ইস দিশা মে এক আকর্ষক আউর গম্ভীর প্রয়োগ হো সকতা থা। উসমে রেণু নে এক বড়ে সমুদায়কে উচ্ছেদন আউর পুর্নবাস কী ভাবনাত্মক সমস্যাকে মাধ্যম সে জাতীয় অন্তর্লয়ন কে প্রশ্ন পর বিচার হী নহী কিয়া হ্যায়, উসে এক সামাজিক ঘটনা-ক্রম মে সাকার ভী কিয়া হ্যায়। ..... উচ্ছেদিত সমুদায় কো এক দেশ তো মিলা, পর ওয়াতন ছিন গয়া। ইস রাজনীতিক দেশ মে উনকা অপনা সমাজ ন থা - এক সর্বথা দুসরী নয় কে সাথ এক হোনে কী সমস্যা ইসলিএ ভী ভাবনাত্মক রূপ মে জটিল হো গয়ী থী।" [৩৫]

স্বাধীনতার সাথে এই দেশ বিভাজন, উচ্ছেদিত মানুষদের জন্য এনেছিল অকল্পনীয় কষ্ট এবং সমস্যা। রাজনৈতিক কারণে জন্মভূমি ছেড়ে এসে তাদের যেখানে পুর্নবাসন হল, সেই স্থানটিতে তাদের নিজেকে পরবাসী মনে হতে লাগল। রেণু এই অনুভূতিকে লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর 'জুলুস' উপন্যাসে। এইসব শরণার্থীদের সাথে দেশ ও সমুদায়ের সংযোগের কথা বললেন। এই উপন্যাসের প্রধাণ চরিত্র পবিত্রা-র মাধ্যমে রেণুর অন্যান্য উপন্যাসের মত তাঁর নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পবিত্রা উচ্ছেদিত মানুষদের এই নতুন দেশ স্বাধীন ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে ভাবতে বলে। সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে সেও সহমত পোষন করে। দেশ ভারতবর্ষ। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা দেশ নয়, প্রদেশ। এই দেশের অধিবাসীরা কেউ ভিন্ন নন, বাঙালী-বিহারী-ওড়িয়া নন, তারা ভারতীয়। অন্ধ প্রাদেশিকতার উপসর্গ রোধ করতে রেণু সর্বভারতীয় আবহ তৈরী করতে চেয়েছেন, 'জুলুস' উপন্যাসে রেণুজীর সৃষ্ট চরিত্র গুলির এই আবেদন ভারতীয় সাহিত্যে একটি বড় ঘটনা।

'জুলুস' ফণীশ্বর নাথ রেণুর চতুর্থ উপন্যাস (প্রকাশকাল - ১৯৬০) উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হবার আগে এইটি 'রোমাঞ্চশূন্য প্রেম-কথা কী এক ভূমিকা' নামে কাহিনী হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের কথা ক্ষেত্র বিহারের পূর্ণিয়া জেলার একটি নতুন বসতি গ্রাম নবীন নগর (বা নোবীনগর) স্থানীয় মানুষজনদের কাছে "গোড়িয়র গাঁও" নামেও পরিচিত। নবীননগর কলোনীর আরেকটি নাম পাকিস্তানী টোলা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীরা যেহেতু আগত, সেইহেতু পাকিস্তানী টোলা নামের উৎপত্তি। সেই সময় বিহারের পুর্নবাসন মন্ত্রী ছিলেন - মহম্মদ ইসমাইল নবী। তিনি ছিলেন এই কলোনীর স্থাপয়িতা। তাঁর নামানুসারেই এই কলোনীর নাম হয় - নবী নগর। এই নবীনগর লোকমুখে নবীন নগর হিসাবে উচ্চারিত।

১৯৪৭ এ দেশবিভাগের পরিনাম স্বরূপ এই শরণার্থীদের ভারতবর্ষে আগমন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার জুম্মাপুর গ্রামের হিন্দু অধিবাসীরাই উচ্ছেদিত হয়ে এই নবীন নগর গ্রামের অধিবাসী। উদ্বাস্তু কলোনীর এই শরণার্থীদের মধ্যে জুম্মাপুর গ্রামের জমিদারের মেয়ে পবিত্রাই দলনেত্রী সেই প্রধান চরিত্র। নতুন বসতিতে এসে নানা বিষয়ে পরামর্শ সেই দেয়। পবিত্রা ও অন্যান্য শরণার্থীদের ঘিরেই এই উপন্যাস।

জন্মভূমি জুম্মাপুর গ্রাম রাজনৈতিক কারণে ছেড়ে এসে সবাই নবী নগর গ্রামে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। স্বভাবতই তাদের আবাল্য পরিচিত জুম্মাপুর গ্রামের সাথে সব কিছুর তুলনা আসে। জন্মভূমি ছেড়ে আসবার বেদনা তারা কখনোই ভুলতে পারেন না। নিজের দেশে এসেও মনে হয় পরবাসী। মাছভাত প্রিয় ও কৃষিজীবি জুম্মাপুর বাসীদের জন্য ভারত সরকার পূর্ণিয়ার নবীনগর গ্রাম নির্বাচন করেছিলেন। এখানকার সাথে তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের সাদৃশ্য আছে। পবিত্রা একদিন গ্রামের লোকদের বলছিল - "হম লোগো কা ভাগ্য অচ্ছা হ্যায় কি ইস জিলে মে হমে বসায়া গয়া। ইহা ধান আউর পাট কী খেতী হোতী হ্যায়, হম ভী অপনে দেশ মে ধান আউর পাট কী খেতী করতে থে। ইহাঁ কে লোগ ভী মছলী-ভাত খাতে হ্যায়। গাঁও-ঘর, বাগ-বগীচে, পোখরে, আউর নদী - সবকুছ অপনে দেশ জৈসা।"

পবিত্রার এই কথায় অন্য অনেক শরণার্থীদের মত হরলাল সাহার মন ভরে না। সে পবিত্রার কথার প্রতিবাদ করে - " সে হুতি পারেনা। (এই সা হোনা অসম্ভব হ্যায়) ..... কঁহা অপনা দেশ আউর অপনে দেশ কী মিটটী, আউর অপনে দেশ কা চাওল, আউর কহা ইস অদ্ভুত দেশ কা সব 'আজগুবী' ব্যাপার। পতা নহী তুমনে ক্যায়া দেখা হ্যায় পবিত্রা দি। ইহাঁ কী মছলী যে ক্যায়া ওহী স্বাদ হ্যায় জো 'পদ্মা কে ইলিস' যে" [৩৬]

কলোনীতে সরকারী কর্মচারীরা নানা কাজে আসে। টিউব ওয়েল লাগাতে এসে সরকারী কর্মীটি শরণার্থীদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে। কলোনীতে যাতায়াতের ফলে সেও ইদানীং বাংলা বুঝতে শিখেছে। কোনটা নিজের দেশ ? ছেড়ে আসা জন্মভূমি না স্বাধীন ভারতভূমি ? (এ প্রশ্নটা এই উপন্যাসে বার বার আসে) উদ্বাস্তুরা যখন এ নিয়ে আলোচনা করে সরকারী কর্মীটিও সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে।

" ইহ আপ লোগ 'অপনা দেশ- অপনা দেশ' ক্যায়া বোলতে হ্যায় ? দেশ কা মতলব ? ক্যায়া মানো ?

দেশ কা মানে আর কেয়া হোগা - দেশ কে মানে দেশ। .....

দেশ মানে দেশ। তো ক্যায়া হিন্দুস্তান অপনাদেশ নহী হ্যায় ? আপ লোগো কা দেশ নহী হ্যায় - হিন্দু স্তান ক্যায়সে অপনা দেশ হোগা ?

কালাচাঁদ ঘোষ চতুর নৌজওান হ্যায়। উসনে অপনী ভারী আউর মোটী হঁসী সে বাত কো হল্কী করনে কী চেষ্টা কী - হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ । আরো বাপু। আপ দেশ কা জো মানে বুঝতা হ্যায় আসল মে হম লোগো কা দেশ কা মানে ও নেহী হ্যায়। দেশ কা মানে জৈসে বাংলাদেশ, বিহার দেশ, ওড়ীসা দেশ, ঐসে মাফিক .....

তো প্রদেশ বলিএ। প্রান্ত কহিএ।

ছিদায়দাস সরকারী কর্মচারিয়ো সে বাত করনে কা অবসর ঢুঁড়তা রহতা হ্যায়। উসোন দাঁত নিপোড়কর কহা - ওবরসিয়র বাবু, দেশ বোলিএ প্রদেশ বোলিএ কি প্রান্ত কহিএ - অব তো জো হ্যায় সো য়হী নোবীন-নগর গ্রাম।" [৩৭]

সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎসাদিত হয়ে শত সহস্র অসহায়, ছিন্নমূল বিপর্যস্ত মানুষের মতো এই নবীন নগর কলোনীর মানুষরাও হয়েছিল দিশেহারা। পবিত্রা এদের সব সময় উৎসাহিত করতো, স্বাধীন ভারত ভূমিকে নিজের দেশ বলে মেনে নিতে, সামগ্রিক পরিবেশের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জুম্মাপুর থেকে উৎসাদিত সমাজকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে।

রাজনৈতিক খড়্গের আঘাতে দ্বি-খন্ডিত বাংলার হতভাগ্য বাঙালি জাতির সমস্যা জর্জর দুর্দশাময়-বর্তমান ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ রেণুজীকে যথেষ্ট ভাবাতো, ভাবিত করতো। 'জুলুস' উপন্যাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই উপন্যাসেও রেণুজীর অন্যান্য উপন্যাসের মত পবিত্রা রেণুর প্রতিনিধি, আশার প্রতীক। সে স্বাধীন ভারতভূমিতে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্বদেশকে খুঁজে পায়। পবিত্রা তার গ্রামবাসীকে বলে - 'জানতে হো। - ঠাকুর(ভগবান) কা আদেশ হ্যায় ইহা কী মিটটী কো প্যায়ার দো-জুম্মাপুর আউর নবীন নগর এক হী হ্যায়।" নতুন স্বদেশে অজানা আশংকা পবিত্রা কাটিয়ে ওঠে, উপন্যাস শেষে যে স্বগতোক্তি করে তা এই উৎসাদিত মানুষের নতুন জীবন বাণী। সেখানে ব্যক্তি নয়, সমূহই বড় কথা, প্রাদেশিকতা নয়, জ্যাঙ্গোভিয়ান নয়, অখন্ড ভারতীয়তাই বড় কথা - "ম্যায় অকেলী নহী। ম্যায় নিসঙ্গ নহী। ম্যায় কহী নির্জন মে নহী। ম্যায় সব বিশাল পরিবার কী বেটী হুঁ। ..... ইন আত্মীয় স্বজনো কে বীচ পারস্পরিক সহানুভূতি আউর সহযোগিতা কো ফির সে পণ পাওগী - অপরিচয়, অজনবীপণ, উদাসীনতা, অকেলাপন, আত্মকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা কী দূর করকে ভুলে-ভটকে লোগো কো অপনে লোগে কে পাস লোটাকর লানা হোগা। ..... ম্যায় অপনী সত্তা কো ইস সমাজ মে বিলীন কর রহী হুঁ..... লোক সংস্কৃতিমূলক সমাজকে গঠন কে লিএ।" [৩৮] এই ভাবেই স্বাধীন ভারতভূমিতে পবিত্রা খুঁজে পায় তার স্বদেশ।

ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের এই ভাবে স্বদেশ খুঁজে পাওয়াই 'জুলুস' উপন্যাসের মূল্য প্রতিপাদ্য। সেই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অন্তঃসার শূন্যতা, ছোটনবাবুদের মত জনগণের

সাথে সম্পর্কহীন স্বার্থপর রাজনীতি, গ্রাম্য দলাদলি, জাতিবাদ, 'ভাইভাতিজাবাদ' (স্বজন-পোষণ নীতি) সমাজ সেবার নামে, সরকারী পয়সার আত্মসাৎ। স্বাতন্ত্র্যোত্তর এই সব উপসর্গ যা দেশ ও সমাজকে সুস্থভাবে বিকশিত হতে দিচ্ছে না। উদ্বাস্তুদের সমস্যার সাথে রেণু এইসব সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশ ও প্রদেশের প্রশ্ন তুলে সর্বভারতীয় ব্যাঞ্জনা দিয়েছেন।

পল্টুবাবু রোড : সামাজিক সংকট ও নৈতিক সংকট

ফণীশ্বর নাথ রেণুর শেষ উপন্যাস 'পল্টুবাবু রোড'। এই উপন্যাসটি প্রথমে পাটনার 'জ্যোৎস্না' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, কিছুদিন প্রকাশিত হবার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। পরে রেণুজীর মৃত্যুর পর পুস্তকাকারে ১৯৭১ এ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ পাটনার অনুপম প্রকাশন থেকে হয়।

রেণুজীর পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির সাথে 'পল্টুবাবু রোড' এর বিষয়গত পার্থক্য আছে। গ্রামীন সমাজ থেকে তিনি চলে এসেছেন একটি আধা শহরের মধ্যবর্গের জীবনের মধ্যে। স্বাধীনতা - উত্তর ভারতবর্ষে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেউলেপনায় যে সংকট সমাজ জীবনে নেমে এসেছে, যে মূল্যহীনতা অস্থিরতা, পাপবোধ, ক্লেদ ফুটে উঠেছে মধ্যবর্গের মধ্যে, তা এই উপন্যাসে একই পরিবারের কতগুলি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট। পরিবারের ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে চূড়ান্ত সামাজিক সংকট।

পল্টুবাবু রোড একটি পরিবারের কাহিনী, সময়ের সাথে সাথে এই পরিবারের সদস্যদেরও পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমকালীন বাস্তবতা পরিস্ফুট। স্বাধীনতার পর থেকে শহরে মধ্যবিত্ত বর্গের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তারই বাস্তব চরিত্র এঁকেছেন রেণু।

এই উপন্যাসের কথা ক্ষেত্র পূর্ণিয়া জেলা সদরের সন্নিকটে বৈরগাছী নামক একটি মফঃস্বল শহরে। এই বৈরগাছীর একটি বাঙালী পরিবার, রায় পরিবার। এই বাড়ীর নাম ফুলবাগান। এই বাড়ীর বর্তমান অধিকর্তা লট্টুবাবু ওরফে অমলেন্দু রায়। এই অমলেন্দু রায়ের দুই অগ্রজ বিমলেন্দু রায় ও নির্মলেন্দু রায় দুজনেই তাঁদের দুস্ত্রী সহ মৃত। এই দুই দম্পতীর পুত্র-কন্যারা ফুলবাগানের অধিবাসী। ঘন্টা ও বিজলী। লট্টুবাবুর ছেলেমেয়েরা হল ফ্যালা, রমা, কনা,। রায় পরিবারের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বিজলীই বড়। সে তার কাকার ব্যবসার সহযোগী, গোছমল নামক একজন ধনী ব্যবসায়ীর সিমেন্ট কোম্পানীর অংশীদার। এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র পন্টুবাবু। অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে ধনী ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ফুলবাগানের লট্টুবাবু তার ধর্মপুত্র, রায় পরিবারের ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি গুরুদাদু হিসাবে পরিচিত।

এ সব চরিত্র ছাড়াও রয়েছে কংগ্রেস নেতা মুরলী মনোহর মেহতা, ব্যবসায়ী ছোগমল, অনুপ, গোধন, ভোলা সহায়ের মেয়ে কুন্তলা। এই উপন্যাসে ধারাবাহিক কাহিনী নেই, আছে কয়েকটি দৃশ্যবৃত্তের সমষ্টি।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিজলী। বিজলীর কাকা লট্টু বাবু, এই লট্টু বাবু আবার পন্টুবাবুর ধর্মপুত্র। পন্টুবাবু নির্দেশেই রায় পরিবারের সব কিছু নির্ধারিত হয়। বিজলী সহ সবাই তার হাতের পুতুল। বিজলীর রূপ-যৌবন-বুদ্ধি-শঠতা সবই তাদের ব্যবসা, অর্থ, প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার কাজে ব্যবহৃত হয়। গোছমল, মুরলী সবাইকে সে শরীরের মোহ দিয়ে আকৃষ্ট করে, প্রেমের ছলনা করে। সিমেন্ট পারমিট দানের সরকারী কমিটির মেম্বার হয়, কংগ্রেস নেতা মুরলীর সহায়তায় কংগ্রেসের নেত্রী হয়। পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ পন্টুবাবু, ছোগমল, মুরলী মনোহর সবাই কামনাপীড়িত, এরা তাড়া করছে বিজলীকে। এই স্বার্থের দৌড়ে বিজলী একদিন ক্লান্ত হয়। প্রেম-ভালোবাসা-শ্রদ্ধাহীন জীবনযাপনের ক্লান্তিতে সে আর্তনাদ করে ওঠে। ছোগমল, মুরলী পন্টুবাবুদের মত মানুষদের তার কুকুরের মত মনে হয়। তাকে ঘিরে এদের সম্ভোগের বাসনা, কুকুরের মত, জন্তুর মত।

"বিজলী কা দিল ভী বার বার পুকার কর কহতা হ্যায় - আমি আর পারিনা। ..... পারি না। নহী ঢো সকতী অব এ্যাইসী জিন্দগী .....। হাঁ বিজলী ভী বদলা লেগী, মুরলী মনোহর যেহতা সে। আউর কিসী সেনহী। কুন্তলা সে ভী নহী। সির্ফ মুরলী মনোহর যেহতা কী উজলী টোপী কো কীচড় মে ঘসীটনা চাহতী হ্যায়। উহ লেগী বদলা।

বিজলী বড় বড়ায়ী - কা দুরুষ।

রূপন চিল্লায়া - কুত্তা।

বিজলী হঁসী - রূপন নে ঠীক পহচানা হ্যায়। সতী কুত্তে। ছোগমল মুরলী মনোহর, গোধন, পন্টুবাবু।" ৩১

তিনটার প্রজন্মের কথার মাধ্যমে এই উপন্যাসের সময়সীমা প্রায় একশতাব্দীকে ছুঁয়েছে। স্বাধীনতার পর নতুন প্রজন্মের মূল্য বোধের সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটেছে। কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে সুযোগ সুবিধা বেশী পাওয়া যাবে, এই অংক নির্ণয় করে রাজনীতি হয়। দেশ-প্রেম সমাজ সেবায় কোন আদর্শ নেই। তাই রায় পরিবারের ঘন্টা-ছবি পন্টুবাবুর নির্দেশে সোস্যালিস্ট পার্টির মেম্বার হয়ে যায়। এ ধূর্ততায় মুরলী মনোহরের মত অধঃপতিত কংগ্রেসী নেতাও চমকে ওঠে তার কনিষ্ঠদের রাজনীতি করবার ধরণ দেখে। যে পতন তার হয়েছে তার থেকেও এরা কয়েক ধাপ এগিয়ে।

"মুরলীবাবু বিজলী কী ওড়র দেখ কর বোলে - বাহ! খুব হিসার লগায়া হ্যায়। আধা ঘর কংগ্রেসী আধা ঘর সোস্যালিস্ট ....." ৪০

রায় পরিবারের ঘন্টা ও ছবি সমাজবাদী পার্টির নেতা হয়ে কংগ্রেসী দিদির বিরোধিতা করে। এই দুই জনের দিদির প্রতি আক্রোশ রায় পরিবারের বিসদৃশটিকে আরো তীব্র করে।

একদা বিজলীর কংগ্রেসী রাজনীতিতে যোগদান যেমন পন্টুবাবুর উৎসাহে হয়েছিল, তেমনি ঘন্টা ও ছবির সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়াতেও আছে পন্টুবাবুর পরোক্ষ

যোগসাজস। রায় পরিবারের আর্থিক উন্নতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে রাজনীতির এই নতুন পর্ব সহায়তা করবে জেনেই পন্টুবাবুর তৎপরতা।

"আজ গুরু দাদু নে পীঠ পর হাথ ফেরতে ওয়ে বাদ ঘন্টা সে পুছা - 'ক্যায়া বৈঠ-বৈঠ কয়া করতা হ্যায় ? পড়াই-লিখাই তুমসে হোগী নহী। ..... লীডরী করেগা ?

ঘন্টা নে আশ্চর্য সে পন্টুবাবু সে আঁখে মিলায়ী। পন্টু বাবু অপনী থৈলী সে মসালা ইস তরহ নিকালনে লগে মানো থৈলী মে লীডরী হো। অভী কুছ দের পহলে জুলুস কো দেখকর ঘন্টা কে মন মে সোশালিস্ট পার্টি মে কাম করনে কী বাত জগী থী। ফির তুরন্ত হী বিলা গয়ী থী। পন্টু বাবু নে কহা - বোলো ?

ঘন্টা নে কহা - "লেকিন সুনতে হ্যায় খুন সে দস্তখত করবাতা হ্যায় ? - করবাতা হে তো কর দেনা। এক বুঁদ খুন ভী লগেগা না। আউর কয়া।" ৪১

লটবাবু যখন বলে - 'গুরু দাদা অব কয়া হোগা ? .....সোশালিস্ট পার্টি বালা তো ইহাঁ ভী আ গয়া।

পন্টুবাবু নে কহা - "তো কয়া হো গয়া ? সমঝা গত্র লটুবাবু কি খতরে কী কোই বাত নহী। বল্কি কুছ লাভ .....। ৪২

স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্ম জাত ছেলেমেয়েদের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে কোনো জীবনাদর্শ নেই। অর্থ-প্রতিপত্তির পেছনে ছোটাই যেন জীবনের পরমার্থ। এই পরামর্থর জন্য যেন সবকিছু জলাঞ্জলি দেওয়া যায়। এই সংকট যেন শুধু রায় পরিবারের নয়, সমগ্র ভারতের মধ্য বর্গের জীবনের সংকট। ফ্যালা, অনুপ এসব থেকে পরিত্রাণ খুঁজেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের মত সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে ফ্যালা রায় পরিবারের ক্লেদময় জীবন থেকে রেহাই পেতে চেয়েছে। অনুপ কুন্তলার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে দুঃস্থ লোকদের সেবাব্রত

নিয়েছে। রেণুজীর ত্রিশবছর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যোগাযোগ ছিল। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। অনুপ ও ফ্যালাতে তার ছায়া আছে (ফণীশ্বর নাথ রেণুর জীবনে ও সাহিত্যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দর প্রভাব নিয়ে শংকরী প্রসাদ বসু তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ গ্রন্থে (৭ম খন্ড - পৃঃ ৫১১-৫১৯) বিস্তৃত ও আলোচনা করেছেন)।[৪৩]

উপন্যাসের শেষ চমক ভোলা সহায়ের মেয়ে কুন্তলার সাথে বৃদ্ধ পন্টুবাবুর বিবাহ ও মৃত্যু।

কুমারী কন্যার সমস্যা ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকালের সমস্যা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই কুমারী কন্যাদের সমস্যার প্রকৃতি কিভাবে পাল্টে গিয়েছে, এই উপন্যাসে রেণু তা লক্ষণীয় করে তুলেছেন।

বিজলী, পন্টুবাবু এদের জীবন কি সত্যই অর্থহীন, উদ্ভট ? "কুছ অর্থহীন লগনেবালী ত্রিন্দ গিয়ো কী ইহ কহানী কয়া সচমুচ অর্থহীন হ্যায়। ইয়া উসমে এক পুরে উত্থান কা মর্মান্তিক দর্দ ভরা হুআ হ্যায়। ইস অবসাদক পরিস্থিতি কে প্রতি রেণু কী উন্মুখতা নিরর্থক নহী হো সকতী। ওয়ে ইস পরিবর্তন কী দিশা কো হী তো পহচাননে কা ভরসক প্রযত্ন কর রহে হ্যায়। উপর সে ইহ পরিবর্তন জিতনা তীব্র গামী হ্যায়, ভীতর সে উহ উতনা খোখলা কয়ো হ্যায়। ইহ পরিবর্তন কিসকে হিত মে হ্যায়। কিন নিহিত স্বার্থো কী আপূর্তি করতা হ্যায়। কহাঁ জা রহী হ্যায় ইহ সড়ক আউর কহাঁ লে জা রহী হ্যায় হমে। উপন্যাস কী ইহ সমস্যা কয়া পুরে সামাজিক বিচলন কে অতিরিক্ত আউর কুছ নহী হ্যায় ?"[৪৪]

রেণুজীর 'পন্টুবাবু রোডই' একমাত্র উপন্যাস যেখানে তিনি কোন আশার আলো দেখাতে পারেননি। এই উপন্যাসে মানুষের কোমল অনুভূতি সিমেন্টের মত জমে গিয়েছে। মানুষের শুভবুদ্ধি, চেতনার পথ বুঝি রুদ্ধ হতে চলেছে।

"বিজলী মুরলী মনোহর কা হাথ ছুড়া কর, ধীরে সে খড়ী হো গয়ী - মুরলী, ম্যায় লোহা-সীমেণ্ট আউর পত্থর কা কারবার করতী হুঁ। ..... আউর কোই ব্যাপার নহী জানতী।

মুরলী নে উসে ফির বৈঠায়া, অপনে সামনে কুর্সী পর। সাহস করকে উসনে কহা - মুঝে লোহা আউর সীমেণ্ট হী সমঝো।" [৪৫]

রেণুজী কি বলতে চেয়েছেন এই লোহা আর সিমেণ্ট হয়ে যাওয়াই এই সময়ের অন্তর্নিহিত সত্য ? 'ময়লা আঁচলে' ডাঃ প্রশান্ত আবার গ্রামে ফিরে এসে নতুন করে কাজ শুরু করেছে 'পড়তি পরিকথা'র বন্ধ্যা জমিতে ফসল ফলেছে। 'দীর্ঘতপা'র বেলার তপস্যা স্বাধীন ভারত ভূমিতে প্রাণ পেয়েছে। 'জুলুস' এর উদ্বাস্তু পবিত্রা খুঁজে পেয়েছে তার স্বদেশ। কিন্তু 'পল্টুবাবু রোডে' কোনো আশার আলো নেই। এই হতাশা গ্লানি যেন অনিবার্য। যেমন কয়েক-দশক আগে সতীনাথের 'ঢোঁড়াই'এর থানায় সারেণ্ডার করতে যাওয়া অনিবার্য ছিল। সতীনাথ 'উত্তর ঢোড়াইচরিতে' যা বলতে চেয়েছিলেন তা আজো অব্যাহত। রেণুজী তাঁর উপন্যাস-গুলিতে যে পরিবর্তিত ভারতের ছবি সতীনাথ সূচনা করেছিলেন সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। তবে পূর্ববর্তী লেখা গুলিতে যে আশার আলো তার অনেকটাই নিজস্ব নির্মিতি এখানেই সতীনাথের সঙ্গে তার পার্থক্য। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে জীবনের শেষ পর্বে আবার এসে 'পল্টুবাবু রোডেই' তাঁর সাহিত্যিক বাস্তববোধ তাঁর সচেতন রাজনৈতিক যাতায়ত ও ব্যক্তিগত আদর্শকে অতিক্রম করতে পেরেছে।

সতীনাথের শেষ পর্বের উপন্যাসগুলির মত রেণু ও ক্রমশ গণ আন্দোলনের যথার্থতা থেকে সৃষ্ট মানসিকতার উপন্যাস থেকে ব্যক্তি মানসের অন্তর্জগতের দিকে চলে আসছিলেন। আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় দুজনের উপন্যাসের পটভূমি হয়েছে, ছোট-মফঃস্বল নগর। যেখান-কার গ্রামীন জের ঘুচে যায়নি। ট্র্যাডিশনাল ও পারিবারিক সম্পর্কও বজায় আছে। এই রকম কথা ক্ষেত্রের বাইরে এসে বৃহৎ মেট্রোপলিটান পটভূমিতে তাঁদের উপন্যাসের কথাক্ষেত্র খোঁজেননি।

কালগত দিক থেকে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' যেখানে শেষ হয়েছে 'ময়লা আঁচল' সেখানে শুরু হয়েছে। 'ময়লা আঁচল' কি 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' ?

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ভারতীয় রাজনীতির যে পর্বে শেষ হয়েছে, রেণুজীর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাস থেকে তার পরের পর্ব শুরু হয়েছে। সতীনাথের উপন্যাসে ছিল পরাধীন ভারতের রাজনীতি। স্বাধীন ভারতের রাজনীতি তিনি তাঁর উপন্যাসে আনেননি। কিন্তু রেণু এনেছেন, এ ছাড়াও লক্ষ্যনীয় পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের রাজনীতির সাথে রেণুজী যুক্ত ছিলেন, তার রচনায় অনেক সময়েই এই দুই সময়ের তুলনামূলক ছবি এসেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনীতি এক, আর দেশ শাসনের রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা। যে আত্মত্যাগ, যে দুঃখবরণ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে তার অবকাশ নেই।

এই দুই শিল্পকর্মে যুগগত জীবনের যে ছায়াপাত হয়েছে তা আমরা বিশ্লেষণ করেছি। সতীনাথ ভেবেছিলেন 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' উপন্যাসের তৃতীয় চরণ লিখবেন তিনি। তার নামও ভেবে রেখেছিলেন 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত'। সতীনাথের অগ্রজ ভূতনাথ ভাদুড়ীর কথা থেকে সেই অজাত উপন্যাসের বিষয়বস্তুও জানা যায় - " তৃতীয় চরণে ঢোঁড়াই -এর স্বাধীনোত্তর রাজনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে লেখার ইচ্ছা ছিল। স্বাধীনতার পর দেশশাসনে বিশৃংখলা, আমলাতন্ত্র, সরকারি অব্যবস্থা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা, অর্থলোলুপতা, স্বার্থপরতা, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থ-হরিজন সমস্যা - যা পরবর্তী কালের তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্পে প্রকাশ পেয়েছে - এই সবই লেখার ইচ্ছা ছিল - 'ঢোঁড়াই তৃতীয় চরণে'। [৪৬]

সতীনাথের সাহিত্যিক উত্তরপুরুষ রেণু এই কাজটি সম্পন্ন করলেন। রেণুজী সতীনাথের এই উপন্যাসের পরিকল্পনার কথা জানতেন। গুরুদেবের অনুরণীয় ইচ্ছা চিত্রিত করলেন -

'ময়লা আঁচলে'। 'ময়লা আঁচল' থেকে 'পল্টুবাবু রোড' পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্যের একই ধারার বিভিন্ন রূপের পৌনঃপুনিক আত্মপ্রকাশ। স্বাধীনতার পর গ্রামাঞ্চলে যে পরিবর্তন এলো - লাডলীবাবুরা ক্ষমতাসীন হল, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বঞ্চনা ভীব্রতর হলো - সেই পরিবর্তনের চেহারা স্পষ্ট রূপ নিতে বছর দশেক সময় লেগেছে। রেণুজী সেই পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে - 'ময়লা আঁচলে' রূপ দিয়েছেন। তাই 'ময়লা আঁচল' কে যদি 'উত্তর ঢোঁড়াইচরিত' বলি তবে তা অত্যুক্তি হয় না। 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র শেষে এসে বোঝা যায় এটা উপন্যাসের শেষ নয়, শুরু। সতীনাথ নিজে '৪৭-এর পর আর বেশিদিন রাজনীতিতে থাকতে পারেননি, কিন্তু রেণুজী থেকেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে ৭০ দশকের রাজনীতি পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ঢোঁড়াই থেকে কালীচরণ, লাডলীবাবু থেকে ছোটনবাবু সবই তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ও রূপান্তরের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এর অসমাপ্ত সমাপ্তির অব্যাহত গতি 'ময়লা আঁচলে'ও স্পষ্ট হয়েছেই এবং পরবর্তী রচনাগুলিতেও সেই ধারা অক্ষুন্ন থেকেছে।

গ্রামে-গাঁথা ভারত আমাদের দেশ, তার নিদারুণ দারিদ্র, তার অন্তহীন ঋণভার, তার কারুশিল্প, কুটির শিল্পের উৎখাত হয়ে যাওয়া, তার জলকষ্ট, পথকষ্ট, তার নিত্য অনাহার ও নৈমিত্তিক দুর্ভিক্ষ, তার অশিক্ষা অস্বাস্থ্য অবুদ্ধি, তার ভয়াবহ নিরুদ্যম - ইংরেজ শাসনের দুশ বছরের এই রূপ সতীনাথ ও রেণু কার চোখ এড়ায়নি। শহুরে সংস্কৃতির উজ্জ্বলতাও অতি ক্ষীনজীবি। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাবিধি আত্মস্বার্থে যদি একটি শহুরে এলিট সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিল। ইংরেজ যে ভারতবর্ষকে রেখে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তাকে বলেছেন 'ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট'।

এই দীনতার আবর্জনা নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের যাত্রা শুরু। তারপরে আমরা আজও বিশেষ এগুতে পারিনি, গ্রামে গ্রামে দারিদ্র অস্বাস্থ্য অশিক্ষা তেমনি ভয়ংকর। কিন্তু ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশে 'স্বাধীনতা'ই এল, আর কিছু এল না - এটা কিন্তু

ঠিক নয়, রেণুজী এই দিকটিও নির্দেশ করেছেন। তাঁর শেষের উপন্যাস (পল্টুবাবু রোড) টি বাদ দিলে বহু মূল্যে পাওয়া এই স্বাধীনতা অন্য একটা বৃহত্তর বিপ্লবের দুয়ার খুলে দেয়। সেই বৃহত্তর বিপ্লবের অন্তর্গত হল দেশগঠনের উদ্যম। রেণুর উপন্যাসে এই উদ্যমের উপাসক চরিত্র একাধিক আছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তারা এই উদ্যমকে ব্যাহত হতে দেয় না। অনুজ্জ্বল বাস্তবে অবস্থান করেও তারা স্বপ্ন দেখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

পরাধীন ভারতবর্ষে সতীনাথের মত যে বিশ্বাস নিয়ে রাজনীতিতে রেণুজী পদার্পণ করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা অটুট থাকেনি। স্বাতন্ত্র্যোত্তর ভারতীয় রাজনীতির কুৎসিৎ দিক একাধিক বার অনাবৃত করেছেন তাঁর একাধিক রচনায়। কিন্তু সাহিত্য রচনা ও জীবনের শেষ পর্বে এসে সমকালের রাজনীতিকে তাঁর বন্ধ্যা মনে হয়েছে। হয়ত কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সত্তর দশকের রাজনীতি, জরুরী অবস্থা ঘোষনা, জয়প্রকাশের আন্দোলন, তাঁর পদ্মশ্রী উপাধি ত্যাগ, আশৈশব পরিচিত ভূমি, তাঁর সাহিত্য রচনার কথা ক্ষেত্র-পূর্ণিয়ার ফরবেশ গঞ্জে বিধান সভার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পরাজয় তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। ফণীশ্বর নাথ ভারত সরকারের কাছ থেকে পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন, এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভাতা। কিন্তু ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি তাকে অস্থির করে ফেলেছিল। "বার বার মনে হয়েছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে, ছটফট করছি নিজের হাড়মাংসের মধ্যে, চর্তুদিকে কী অসহ্য ভয়ংকর অবস্থা, এই ভারতবর্ষ কি আমরা চেয়েছিলুম ? রাষ্ট্রপতিকে পদ্মশ্রী ফেরত দিয়ে লিখেছিলেন, 'পদ্মশ্রী' এখন আমার কাছে 'পাপীশ্রী' বলে মনে হচ্ছে। ভাতা প্রত্যাখান করে রাজ্যপালকে লেখেন, " ঐ বৃত্তি নিতে আমি অপমান বোধ করি।"[48] বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আশা নৈরাশ্য, সাফল্য ব্যর্থতার অগনিত তরঙ্গের ওঠা-পড়ায় ... ফণীশ্বর নাথ জীবনসত্য খুঁজে পেয়েছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণের কাছ থেকে। জয় প্রকাশের আন্দোলনে যোগ দেবার পর "জনজাগরণ যে সাহিত্য কার কী ভূমিকা" (প্রবন্ধ : 'শ্রুত-অশ্রুত পূর্ব গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত) বলেছেন - "যারা একথা বলেন যে, এই আন্দোলনের পিছনে জনসংঘ এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের লোকেরা আছেন, তাঁরা যেন বুঝে নেন যে, তাঁরা ছাড়াও আরও একজন অতিরিক্ত রামকৃষ্ণ ভক্ত এই আন্দোলনে

আছেন যাঁর নাম ফণীশ্বর নাথ রেণু, যাঁর বিশ্বাস - এই দেশে গান্ধীজীর আগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের থেকে বড় বিপ্লবী হননি। যাঁরা দরিদ্র নারায়ণের সেবা করাকে আসল পূজা বলে মনে করেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াবাদী কে বলবে ? ..... আমি জানি রামকৃষ্ণ পরমহংস মার্কসের থেকে ভিন্ন কিছু বলেননি, বরং বেশী কিছু বলেছেন যা সময়ের ব্যবধানে সত্য প্রমানিত হচ্ছে।" [৪৮]

রেণুজীর উপন্যাসে রাজনীতি এসেছে, কিন্তু তিনি কখনো সুখদুঃখ-বিরহ-মিলন পূর্ণ জীবনকে ভোলেননি। জীবনের আনন্দ আবেগে তিনি বলেন - "জীবন শুধু খুন আর ধর্ষনই করেনা, জীবন গড়তেও পারে, গড়ছেও। তা রচনা করছে সমাজের জন্য, বন্ধ্যা ধরনীকে শস্য শ্যামলা করবার জন্য। ..... সমাজকে মানবিক আর মানুষকে সামাজিক করে তোলাই মুক্তির একমাত্র পথ। আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক সোনা ফলতে পারে। কিন্তু প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই। আজ মানুষ কেবল যন্ত্রই চালাচ্ছে। টেকনলজির যুগে আমরা জীবন-উপভোগের আসল টেকনিকই হারিয়ে ফেলেছি"। [৪৯]

"ময়লা আঁচল" - 'পরতী পরিকথা' এই দুই উপন্যাসে রেণুজী যে অভিজ্ঞতার জগৎকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, দ্রুত-সামাজিক পরিবর্তনের কারনে তাঁর সেই চেনা জগৎ অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। যে গ্রামাঞ্চলের কথা এই দুই শিল্পকর্মে তিনি চিত্রিত করেছিল, ১৫-২০ বছর পরে তারও পরিবর্তন হয়। তিনি তো কষ্টসাধ্য কল্পনার বর্ণনাত্মক রচনা লেখেননি, যা লিখেছেন তার সবটুকুই নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানা।

রেণুজীকে একবার সুরেশ শর্মা প্রশ্ন করেছিলেন আপনার সব থেকে সুখের মুহূর্ত কোনটি ? কিছুক্ষন চোখ বন্ধ করে চুপ করে থাকবার পর রেণুজী বলেছিলেন - "জব ভী কি সী নই রচনা কা আইড়িয়া মেরে দিমাগ মে আতা হ্যায়, ইহ মেরে লিয়ে অকথনীয়

সুখ কা ফন হোতা হ্যায়, লগতা হ্যায় জৈসে ট্রেন কী কিসী লম্বী যাত্রা মে রাত ভর সোনে কে বাদ সুবহ আঁখ খোলকর খিড়কী সে ঝাঁকু তো অচানক অপনে গাঁও কা স্টেশন দীখজায় । দূর গাঁও কে সীমান্ত পর খজুর বৃক্ষো কে পীছে সূর্যোদয় হো রহা হো আউর বগল সে গুজরতী হুই ফোনকে তারপর অপনে ইলাকে কী খাস চিড়িয়া পুঁছ হিলা রহী হো ...।" [৫০]

কিন্তু রেণুজী তাঁর রচনার এই গ্রামানিক জগত থেকে সরে এসেছিলেন। 'ময়লা আঁচল' এ খ্যাতি পাবার পর পূর্ণিয়ার গ্রাম ওরাহী হিঙ্গনা থেকে পাটনাতেই তাকে বেশী সময় থাকতে হত। শেষের দিকে ফসল বোনাও কাটার সময়ই তিনি গ্রামে যেতেন। ধীরে ধীরে তাঁর পরিচিত গ্রামও ক্রমশঃ পান্টে যাচ্ছিল। নানাভাবে। তাঁর 'ময়লা আঁচলে'র কথাভূমি নানা সমস্যায় অধিকতর মলিন হচ্ছিল। ভারতীয় গ্রামজীবনের ঐ সংকট কালে জয় প্রকাশ নারায়ণ যখন রেণুজীকে আবার ময়লা আঁচলের মত আরেক খানি উপন্যাস লিখতে বললেন, তিনি তা লিখলেন না। কারণ ঐ অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে তিনি সরে এসেছেন। সতীনাথ যেমন 'উত্তর চৌড়াই চরিত' না লিখবার কারণ হিসেবে নিজের 'অপর্যাপ্ত' অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন সেই 'অপর্যাপ্ত' অভিজ্ঞতা রেণুজীর ক্ষেত্রেও সত্য হয়েছে। 'ময়লা আঁচল' - 'পরতী পরিকথা'র অগ্রবর্তী রচনা হিসেবে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন 'কাগজ কী নাও' উপন্যাসের পরিকল্পনা। " রাজনীতিকে আধুনিক দাঁও-প্যাচ সে অনভিজ্ঞ রেণু চুনাও হার গয়ে। মহীনো বাদ পটনা বাপস হুঁএ, তোর হার কে দুঃখ সে মুক্ত নয়ী তাজগী লেকর। কহা - " লেখন কে লিএ কাফী 'কচ্চামাল' বটোর লায়া হুঁ। অপনে গাঁও, ঘর, উহা কে লোগ, উনকী সমস্যা ও সে পুরী তরহ কট গয়া থা, সো চুনাওকে বহানে হী একবার ফির সে সারা করীব যে সমঝানে কা মৌকা মিলা হ্যায় আউর অব নয়া উপন্যাস লিখুগাঁ। 'ময়লা আঁচল'-'পরতী : পরিকথা' কী আগলী কড়ী - 'কাগজ কী নাও'।[৫১] কিন্তু রেণুজী তা শেষ করতে পারেননি।

সতীনাথ ও রেণু দুজনকেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল তাঁদের রাজনৈতিক তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষ - বিহার তথা পূর্ণিয়ার সাধারণ

মানুষের জীবনের যে বিশুদ্ধ ছবি এঁদের রচিত সাহিত্যকর্মে পাই, তা ঐ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকেই আহরিত। এই শিল্পকর্মে যুগগত জীবনের যে ছায়াপাত ঘটেছিল তাতে অবশ্য এই দুই স্রষ্টার সৃজনীশক্তির ও জীবন দর্শনের নিজস্ব সংযোজন ও কিছু হয়েছে। যে রাজনীতি ঐ সূচনা পর্বে তাঁরা করেছেন তা ছিল পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতির ছবি সতীনাথ উপন্যাসের বড় ক্যানভাসে আঁকেননি, রেণুজী এঁকেছিলেন। সতীনাথ যেখানে থেমে গিয়েছিলেন, রেণুজী সেখান থেকে আরো বিস্তারিত ভাবে শুরু করেছিলেন।

সতীনাথের ঢোঁড়াই'এর বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের অগ্রগতির ছন্দটি মিলেছে। ঢোঁড়াই সমাজের যে অংশের মানুষ সেই অংশের ও ক্রমবর্ধমান চেতনার প্রতীকি বিগ্রহ যে। পূর্ণিয়া জেলার এককোনে জিরানিয়ার উপকণ্ঠে তাংমাটোলির গ্রাম্য ঢোঁড়াই কেমন করে কোন কোন অভিজ্ঞতার ধাক্কায় কতবার রিক্ত হতে হতে নতুন ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক মানুষ হয়ে উঠল - দেশের সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থানের এক বীরোচিত পর্বই এই উপন্যাসের প্রধান প্রসঙ্গ।

গোপাল হালদার সিদ্ধান্ত করেছিলেন "সতীনাথ বুঝেছেন গান্ধী আন্দোলনের উত্তর-পুরুষ নেই তাই প্রস্তাবিত 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' লেখা হয়নি। কিন্তু তাই বা হবে কেন ? যে ঢোঁড়াই'এর বিবর্তন সতীনাথ দেখাচ্ছেন, যাঁকে তিনি দ্বিতীয় চরণের শেষে বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের যুবক অবস্থায় ছেড়ে দিলেন, তার ভবিষ্যৎ বিকাশ গান্ধী-আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে কেন ? গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের অধিকার রক্ষার নতুন নতুন আন্দোলনে সে যোগ দেবে। সেইভাবে লিখিত হয়ে যাবে উত্তরোত্তর ঢোঁড়াই চরিত। 'ময়লা আঁচলে' কালীচরণ, বিরসা মাঝির জমি দখলের লড়াই। 'পরতীপরিকথা'র পরানপুর গ্রামের ছোট কৃষকদের ভূমি-সংস্কারের জন্য বড় জমিদারের সাথে সংঘর্ষ ইত্যাদিতেই রয়েছে তার সাক্ষ্য।

স্বাধীনতার পরে গ্রামাঞ্চলে যে পরিবর্তন এলো - সেই পরিবর্তনের চেহারা স্পষ্ট রূপ নিতে বছর দশেক সময় লেগেছে। সতীনাথ সেই পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে খানিকটা

সময়গত দূরত্বের নিরাসক্তি দিয়ে তাকে রূপায়িত করবার সময় পাননি। এই সময়গত দূরত্বের অভাবকেই তিনি 'নিজের অপর্যাপ্ততা' বলেছেন। রেণুজী এই দূরত্বের ফাঁক কে ভরাট করেছেন 'ময়লা আঁচল' রচনা করে। সতীনাথ যে যুগগত সংকটের চিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিতে' রেণুজী তা অংকন করে সতীনাথের উত্তর সাহিত্যিক পুরুষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই 'ময়লা আঁচল' কে যদি 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' বলি তবে তা বোধ হয় অসঙ্গত হয়না।

সতীনাথ যে পরিবর্তমান ভারতীয় জীবনের সাহিত্যালেখ্য নির্মান করেছিলেন 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে', রেণুজী 'ময়লা আঁচলে' তাকে আত্মস্থ করে ঐ পরিবর্তিত জীবনালেখ্যের পরিবর্ধন করেছেন, মহাকালের নিয়মে তা আরো পরিবর্ধিত হয়েছে, সেখানেও অনিবার্য হয়েছে এই ধারার পরবর্তী সাহিত্যিক পুরুষের। এই পরিবর্তিত জীবনের সমাপ্তি রেখা আজো হয়নি। এই অনিঃশেষ জীবনের অন্তহীন সম্ভাবনার বাস্তবতা কে আবিস্কার করবার অন্বিষ্ঠ সাধনার উন্মেষলগ্নে সতীনাথ ও পরবর্তীপর্বে ফণীশ্বর নাথ রেণু দুই স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' উপন্যাস দুটি যেন একটি অপরটির পরিপূরক। ভারতীয় উপন্যাসের জগতে বাংলা ও হিন্দী ভাষায় এই দুটি উপন্যাসের পাশাপাশি অবস্থান, ভারতীয় বাস্তবতারই এক যথার্থ নিদর্শন।

উল্লেখপঞ্জী

১। Illusion and Reality ..... Christopher Caudarll. New Delhi, People's publs. house, 1966 পৃ ২৪৪

২। সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১ম খন্ড। সম্পাদনা শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃঃ - ২১৪

৩। সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১ম খন্ড। সম্পাদনা শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ - ২১৪

৪। সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১ম খন্ড। সম্পাদনা শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ ৪৫৭

৫। সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা - গোপাল হালদার। কলকাতা, অয়ন, ১৯৭৮। পৃ ১০৪।

৬। সতীনাথ গ্রন্থাবলী। ১ম খন্ড : সম্পাদনা শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ ৪৬৭

৭। সতীনাথ ভাদুড়ী ও বাংলা ছোট গল্প, তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সতীনাথ ভাদুড়ী : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান। জলার্ক, কলকাতা, ১৩৯৪। পৃ ১৫৯

৮। সতীনাথ-স্মরণে, সুবল গঙ্গোপাধ্যায়। পাটনা, ভারতীভবন, ১৯৭২। পৃ ৩৬

৯। সতীনাথ গ্রন্থাবলী - ২ খন্ড। সম্পাদনা, শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ ৪৯৫

১০। সতীনাথ গ্রন্থাবলী - ২য় খন্ড। সম্পাদনা, শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ ৪৯৫

১১। সতীনাথ গ্রন্থাবলী - ২য় খন্ড। সম্পাদনা, শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ ৪৯১

১২। সতীনাথ গ্রন্থাবলী - ২ খন্ড। সম্পাদনা, শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ: ৪৯৫।

১৩। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস : অশ্রু কুমার সিকদার। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮। পৃ: ২৬৯।

১৪। ফণীশ্বর নাথ রেণু : সুরেন্দ্র চৌধুরী। নয়া দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৭ পৃ: ৭৭

১৫। ময়লা আঁচল । ফণীশ্বর নাথ রেণু। ১৪ সংস্করণ। নয়াদিল্লী, রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ: ৯৬

১৬। টুটতে-বিখরেতে সপনো কী দাস্তান। ফণীশ্বর নাথ রেণু। শ্রুত-অশ্রুত পূর্ব। সম্পাদনা ভারত যাযাবর। নয়াদিল্লী। রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮৪। পৃ: ১৪২

১৭। জন-জাগরন মে সাহিত্যকার কী ভূমিকা। ফণীশ্বর নাথ রেণু । শ্রুত-অশ্রুতপূর্ব সম্পাদনা, ভারত যাযাবর। নয়াদিল্লী, রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮৪। পৃ: ১৩২

১৮। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড। সম্পাদনা, শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ: ৪৯৫

১৯। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড। সম্পাদনা, শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ: ১৯১

২০। শরৎ চন্দ্র ও বাংলার কৃষক : কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য, কলিকাতা, বর্ণপরিচয়, ১৯৭৫। পৃ: ৬২

২১। সতীনাথ গ্রন্থাবলী - ২য় খন্ড, সম্পাদনা - শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ: ২৩৮-২৩৯

২২। ময়লা আঁচল : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ১৪ সংস্করণ। নয়াদিল্লী, রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮৬ পৃ: ২৩২

২৩। ফণীশ্বর নাথ রেণু : সুরেন্দ্র চৌধুরী। নয়াদিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৭। পৃঃ১২

২৪। ময়লা আঁচল : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ১৪ সংস্করণ। নয়াদিল্লী, রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ : ২৮

২৫। ময়লা আঁচল : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ১৪ সংস্করন। নয়াদিল্লী, রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ : ৭৪

২৬। ময়লা আঁচল : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ১৪ সংস্করন। নয়াদিল্লী, রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ: ৮৪

২৭। পরতী : পরিকথা : ফণীশ্বর নাথ রেণু । ষষ্ঠ সংস্করন। নয়াদিল্লী, রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮২। পৃ : ২৯৮

২৮। সতীনাথ গ্রন্থাবলী। ১ম খন্ড। সম্পাদনা, শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ : ৬৮

২৯। ময়লা আঁচল : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ১৪ সংস্করণ। নয়াদিল্লী। রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ : ৮৪

৩০। ময়লা আঁচল : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ১৪ সংস্করণ। নয়াদিল্লী, রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ : ৪২

৩১। Politics and the Novel in India; ed. by Yogendra K. Malik. New Delhi; Orein long man, 1975. পৃ: 80

৩২। পরতী পরিকথা : ফণীশ্বর নাথ রেনু। ষষ্ঠ সংস্করন। নয়াদিল্লী, রাজকমল প্রকাশন, ১৯৮২। পৃ: ৩০০

৩৩। উনিশশো-ষাটে সতীনাথ. বাণী রায়। সতীনাথ স্মরণে। সম্পাদনা, সুবল গঙ্গোপাধ্যায়। পাটনা, ভারতীভবন, ১৯৭২। পৃ : ৪৯

৩৪। রেণু কা আঞ্চলিক কথা - সাহিত্য : পূর্ণদেব। নয়াদিল্লী, আশা প্রকাশন গৃহ, ১৯৭৩। পৃ : ৮৬

৩৫। ফণীশ্বর নাথ রেণু : সুরেন্দ্র চৌধুরী। নয়াদিল্লী, সাহিত্য অকাডেমি, ১৯৮৭।

৩৬। জুলুস : ফণীশ্বর নাথ রেণু। নয়াদিল্লী, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ১৯৬০। পৃ: ১২০

৩৭। জুলুস : ফণীশ্বর নাথ রেণু। নয়াদিল্লী, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ১৯৬০। পৃ: ১২১

৩৮। জুলুস : ফণীশ্বর নাথ রেণু। নয়াদিল্লী, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ১৯৬০। পৃ: ১৮২

৩৯। পন্টুবাবু রোড : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ৩য় সংস্করণ। পাটনা, অনুপম প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ : ১২২

৪০। পন্টুবাবু রোড : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ৩য় সংস্করণ। পাটনা, অনুপম প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ: ৮৬

৪১। পন্টুবাবু রোড : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ৩য় সংস্করণ। পাটনা, অনুপম প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ : ৮২

৪২। পন্টুবাবু রোড : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ৩য় সংস্করণ। পাটনা, অনুপম প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ : ৮১

৪৩। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ : শংকরী প্রসাদ বসু। ৭ম খন্ড। কলিকাতা, মন্ডলবুক হাউস, ১৯৮৮। পৃ : ৫১১ - ১১

৪৪। ফণীশ্বর নাথ রেণু : সুরেন্দ্র চৌধুরী। নয়াদিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৭। পৃ : ১০৬

৪৫। পন্টুবাবু রোড : ফণীশ্বর নাথ রেণু। ৩য় সংস্করণ। পাটনা, অনুপম প্রকাশন, ১৯৮৬। পৃ : ৪২

৪৬। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, সম্পাদক। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ : ৪৯১

৪৭। সমীর রায় চৌধুরী, 'এখন সকলের দৃষ্টি বিহারের দিকে', কৃত্তিবাস, অগ্রহায়ন, কলকাতা, ১৩৮১।

৪৮। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শংকরী প্রসাদ বসু। কলিকাতা মন্ডল বুক হাউস, ১৯৮৮। পৃ : ৫১৮

৪৯। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শংকরী প্রসাদ বসু। কলিকাতা মন্ডল বুক হাউস, ১৯৮৮। পৃ : ৫১৮

৫০। রেণু সংস্মরণ আউর শ্রদ্ধাঞ্জলি। সম্পাদনা, রাঘবু ঝাইবন সিং ও অন্যান্য। পাটনা, নবনীতা প্রকাশন, ১৯৭৮। পৃ : ১৭৪

৫১।রেণু সংস্মরণ আউর শ্রদ্ধাঞ্জলি । সম্পাদনা, রাঘবু ঝাইবন সিং ও অন্যান্য। পাটনা, নবনীতা প্রকাশন, ১৯৭৮। পৃ : ১২৯

৫২। সতীনাথ গ্রন্থাবলী - ২য় খন্ড। সম্পাদনা, শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ : ৪১৪।